অন্য কোনখানে

বুদ্ধদেব বসু

নিউ এজ পাবলিশার্স লিমিটেড

অন্য কোনখানে

রুমি-কে

ছোটো থেকে বড়ো হচ্ছো ব'লে
রুমি, তোমার এত দুঃখ কেন?
বুড়ো হওয়া যেমন-তেমন হোক,
বড়ো হওয়াই সবার ভালো, জেনো।

'অন্য কোনখানে' ইতিপূর্বে 'রংমশাল' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে বেরিয়েছিলো, কিন্তু শেষ পরিচ্ছেদটি সেখানে ছাপা হ'তে পারেনি। বই ছাপা হ'তে-হ'তে বিস্তর বদলেছি, কোনো-কোনো পূর্বপ্রকাশিত অংশ নতুন ক'রে লেখা হ'য়ে গেছে। সেই সংশোধনের অত্যাচারে প্রকাশকের এবং মুদ্রাকরের ধৈর্যচ্যুতি ঘটেনি ব'লে তাঁদের ধন্যবাদ জানাই।

বইটি ছোটোদের উপন্যাস, কিন্তু লেখকের ইচ্ছা বড়োরাও পড়েন।

বু. ব.

১

'অসিত মানে কী ?'

ছেলেরা ন'ড়ে-চ'ড়ে বসলো, মুখ-চাওয়াচাওয়ি করলো, কেউ-বা মন দিয়ে দেয়াল দেখতে লাগলো।

'অসিত মানে ?' সেকেণ্ড পণ্ডিত সারি-সারি মুখের উপর চোখ চালিয়ে গেলেন। 'কেউ জানো ?···কেউ জানো না ?···এই যে, তোমার নাম তো অসিত, তুমিও না ? নিজের নামের মানে জানো না ?'

অসিত নামের ছেলেটি খুব ভালোমানুষের মতো একটু হাসলো। যেন বলতে চায় আমার নাম যে অসিত সে তো আর আমার দোষ না।

'তুমি—ওহে নবাগত বালক, দি নিউ বয় ইন দি ক্লাস, তোমাকে বলছি।'

পাশের ছেলেটি ব'লে উঠলো, 'ওর নাম তন্ময়, স্যর।'

'কী-নাম ?'

'তন্ময়।'

'বাঃ, নামের তো বাহার আছে। বলো দেখি অসিত শব্দের অর্থ ?'

তন্ময়ের মুখে রক্ত উঠলো, হাতুড়ির বাড়ি পড়তে লাগলো বুকের মধ্যে। সে তো বলবার চেষ্টা করছে কখন থেকেই, কিন্তু বলা কি সোজা! বলতে গেলেই হয়তো আটকে যাবে, আর যখনই আগে থেকে তার ভয় হয়, তখনই ভীষণভাবে আটকে যায়, 'ল', 'ন', কি 'ম'র মতো সোজা শব্দও বের করতে পারে না—আর এ তো 'ক'! কিন্তু না—বলতেই হবে, ভয় করলেই ভয় বাড়ে—ক্লাশের কোনো ছেলে যা জানে না, সে কি তা জেনেও বলতে পারবে না ?

'কী হে ? তন্ময় ?' পণ্ডিত মশাইর কথায় একটু যেন ঠাট্টার খোঁচা। সত্যি, তার ঐ তন্ময় নামটা নিয়ে লজ্জাই করে।

তন্ময় আর দেরি করলো না ; উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'ক্-ক্-ক্-ক্-ক্—'

পিছন থেকে একটি ছেলে অস্ফুট আওয়াজ করলো, 'কক্-কক্-কক্।' মৃদু হাসির ঢেউ উঠলো ক্লাশে। 'চুপ!' পণ্ডিত মশাই কটমট ক'রে তাকালেন । 'বলো তুমি।'

তন্ময় চোখে ঝাপসা দেখলো, কানের কাছে শুনলো পিঁ-পিঁ আওয়াজ। বুক ভ'রে একবার নিশ্বাস নিয়ে সে

ব'লে ফেললো, 'অসিত মানে কালো।' আশ্চর্য মসৃণভাবে বেরিয়ে এলো, কথাটা, কিন্তু এত কষ্ট হ'লো যেন বুক ফেটে যাবে। ব'সে প'ড়ে হাঁপাতে লাগলো।

ক্লাশে আবার একটা ঝিরঝিরানি ব'য়ে গেলো: একটু ঠাট্টার, একটু প্রশংসার। এই সুযোগে ক্লান্তিকর শেষ ঘণ্টার বাকি সময়টুকুকে পড়াশুনো থেকে গল্পগুজবে নিয়ে যাবার চেষ্টায় ক্লাশের মনিটর ইয়াসিন বললো, 'ও খুব ভালো বাংলা জানে, স্যর।'

'বটে? ভালো বাংলা জানো? আচ্ছা তন্ময়, তন্ময় শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ করো তো।'

সন্ধি? সন্ধি তো সে জানে না। তন্ময় ঢোঁক গিলে মাথা নিচু করলো।

'আমি পারি, স্যর,' ক্লাশের ফার্স্টবয় পরিতোষ উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'তৎ, ময়, তন্ময়।'

তৎ, ময়, তন্ময়। এই নাকি সন্ধি? তন্ময় অবাক হ'লো। এ তো কানে শুনেই বলা যায়, এর জন্য আবার বই পড়তে হয়! আর কী-কী শব্দ আছে এ-রকম? মৃন্ময়, চিন্ময়। মৃৎ, ময়, মৃন্ময়; চিৎ, ময়, চিন্ময়। তৎময়, চিৎময় তো বলা যায় না, বিশ্রী শোনায়। সেইজন্যই— ও মা! এই সন্ধি!

সারাদিনের খাটুনির পরে পণ্ডিত মশাইও ক্লান্ত ছিলেন;

পরিতোষকে বোর্ডে ডেকে কতগুলি সন্ধি-বিচ্ছেদ করতে দিলেন তিনি। আর সেগুলি শেষ হবার আগেই ছুটির ঘণ্টা বাজলো।

ইশকুলের শেষ ঘণ্টাটা অনেকক্ষণ ধ'রে বাজে; আর সেই ঘণ্টার সঙ্গে-সঙ্গে ওঠে চীৎকার, বন্য কল্লোল, বাঁধ-ভাঙা জলের মতো বেরিয়ে পড়ে ছেলেরা; ছোটো-ছোটো দলে ভাগ-ভাগ হ'য়ে লাফাতে-লাফাতে ছড়িয়ে পড়ে আশে-পাশের সব ক-টা রাস্তায়। শুধু উঁচু ক্লাশের ছেলেরা গম্ভীর হ'য়ে চলে; নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে, 'ঈশ! কী গোলমাল করতে পারে বাচ্চারা!'

তন্ময় একাই হাঁটছিলো। কোনো বন্ধু তার এখনো হয়নি। ইশকুলে নতুন ভরতি হ'লেও চেনে সে অনেককেই—ছোট্ট শহর তো, প্রায় সকলেই সকলের চেনা। কিন্তু বন্ধু? ঐ তো জিতু, স্বরথ, সুব্রতরা দল বেঁধে হৈ-হৈ ক'রে চলেছে আগে-আগে, কেউ ওরা তালতলা থাকে, কেউ নাগপাড়ায়, অনেকটা পথ একসঙ্গে। একটু পা চালালেই ওদের ধরা যায় গিয়ে—না, থাক, একাই ভালো। কেন এ-রকম হ'লো সে? কেন সে দেখতে এত ছোটো যে সমবয়সী ছেলের কাঁধের কাছে প'ড়ে থাকে? কেন কথা বলতে গেলেই—? স্বরথ একবার পিছন ফিরে তাকালো, পরের মুহূর্তেই সমস্ত দলটি হেসে উঠলো একসঙ্গে।

ঐ সুরথই ক্লাশে তার পিছনে ব'সে ছিলো, যখন সে—যখন সে অসিত শব্দের মানে বলছিলো—বলবার চেষ্টা করছিলো। ঠিকই তো, হাসির কথাই তো এটা, সে-ই বা কেন উঠে দাঁড়িয়েছিলো মিছিমিছি? সে যে জানে, সে-কথা অন্যকে জানাবার কী-দরকার? লজ্জায় তার মাথা নিচু হ'লো।

পোস্টাপিশের কাছে এসে সামনের দলটি রাস্তা ছেড়ে মাঠে নামলো—সকলেই এখান দিয়ে শর্ট-কট করে। তন্ময় নামতে গিয়েও ফিরে এলো, চললো লালধুলোভরা ঘুরপথের শড়ক দিয়েই—ওরা যাক, আরো দূরে চ'লে যাক ওরা।

একটু পরে তার পিছনে কে ডাকলো, 'তন্ময়!'

কী আশ্চর্য, সতীশ! ক্লাস টেন-এর সতীশ! লম্বা সুন্দর চেহারা, ঠোঁটের উপর পরিষ্কার কালো গোঁফ, টেড়ি-কাটা চুল। আইচদের বাড়ির ছেলে। পাকা বাড়ি তাদের, ঝকঝকে শাদা রঙের, বারান্দায় হরিণের শিং, গোল আয়না, সিঁড়িতে কুকুর। কতদিন রাস্তা দিয়ে যেতে-যেতে সে দেখেছে, বারান্দায় ইজিচেয়ারে সতীশ খবরকাগজ পড়ছে। সেই সতীশ! তন্ময় কৃতার্থ হ'য়ে গেলো।

'তুমি ওদের সঙ্গে গেলে না যে?'

'কা-কাদের সঙ্গে?'

'ঐ যে—তোমার ক্লাশের ছেলেরা—'

'এমনি।'

'ইশকুল তোমার ভালো লাগে না, না?'

কেমন ভয় পেয়ে তন্ময় জবাব দিলো, 'লাগে তো! ভালো লাগে।'

'উহুঁ। লাগে না।'

'আপনি জানেন বুঝি?' এবার তন্ময় হেসে ফেললো। গেলো বছর গ্রীষ্মের ছুটিতে তার খুড়তুতো দাদা এসেছিলো বেড়াতে—সে-ও ম্যাট্রিক দেবে সামনের বার। নদীর ধারে বেড়াতে-বেড়াতে সতীশের সঙ্গে তার আলাপ হয়েছিলো, ভাব হয়েছিলো। দুই বন্ধুর সঙ্গে তন্ময়ও বেড়াতো মাঝে-মাঝে: ভালো লাগতো তার, তাদের চলাফেরা, কথাবার্তা, হাসিঠাট্টা, সব ভালো লাগতো। সে-সময়ে সতীশ দু-চারদিন তাদের বাড়িতে এসেছে, এসে তার সঙ্গেও গল্প করেছে একটু। সতীশকে দেখলেই সে তার বই-খাতা-ছড়ানো টেবিলে গম্ভীর হ'য়ে বসতো: কিন্তু দু-বন্ধু বেরিয়ে যেতো একটু পরেই—রোজ তো আর তাকে ডাকতো না—আর তারপর দাদাটি চ'লে গেলো, সতীশও আর আসে না।

'আচ্ছা তন্ময়,' হাতির দাঁতের ছোট্ট কৌটো থেকে এক টিপ নস্যি নিয়ে সতীশ বললো, 'স্কুলের পড়াশুনো বড্ড বাজে লাগে তোমার, কী বলো?'

তন্ময় বিপদে পড়লো। এ-কথার সে কী-জবাব দেবে?

ইংরিজি, বাংলা—ইশকুলের এ-সব পড়া ঠিকই বাজে লাগে তার, অসম্ভব বাজে। বইগুলি বাজে, ছেলেগুলি বোকা—কিচ্ছু পারে না। খুব সোজা-সোজা কথাও অনেক্ষণ ধ'রে বুঝিয়ে বলেন স্যর: তন্ময়ের তখন আর সময় কাটে না, হাই ওঠে। কিন্তু অঙ্ক? অঙ্কের ক্লাশে তার চোখ অন্ধকার। বোর্ডে একটা বিরাট ফ্র্যাকশনের অঙ্ক লিখে দেন মাধববাবু, দেখে মনে হয় উপরে নিচে দু-সার সেপাই সঙিন উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে—পরিতোষ গিয়ে শুধু একটিমাত্র চকখড়ির আঘাতে সেপাইগুলিকে সাবাড় ক'রে দেয়। এই দৃশ্য দেখে তন্ময়ের ভিরমি লাগে, ভক্তিতে পরিতোষের মুখের দিকে তাকাতে পারে না। ক্লাশের আরো কত ছেলে, যে-কোনো অঙ্ক পেলেই তারা খশখশ পেনসিল চালাতে লেগে যায়—সে কিছুই পারে না, কিছুই বোঝে না—কী উপায় হবে তার।

সতীশ তার কাঁধে হাত রেখে আবার বললো, 'এ-সব পড়া তো কত আগেই তুমি শেষ ক'রে ফেলেছো। স্কুলে প'ড়ে তোমার সময় নষ্ট শুধু। সঙ্গীদেরও তো ভালো লাগে না তোমার।'

'না তো!' একটু তীব্র সুরেই প্রতিবাদ করলো তন্ময়।

'তাহ'লে একা-একা থাকো কেন?'

'না তো।'

একটু হেসে সতীশ তার কাঁধ থেকে হাত তুলে নিলো।

এখান থেকে অন্য রাস্তা তার। একটু দাঁড়িয়ে বললো, 'একদিন এসো না আমাদের ওখানে।'

তন্ময় চমকে উঠলো। সবুজ ডাল, কালো দুটো কাক বসেছে, পাতার ফাঁকে রোদ। সেদিকে চোখ প'ড়ে অন্য কথা সে ভুলেই গিয়েছিলো। তাড়াতাড়ি মুখে-চোখে উৎসাহ এনে বললো, 'ক্-ক্-কী বললেন?'

'এসো না একদিন আমাদের ওখানে।'

'কী ক'রে যাবো? কুকুর যে!' এই উত্তর তন্ময়ের মনে এলো, কিন্তু ওটা বললো না, অতগুলো 'ক'র সঙ্গে কুস্তি ক'রে সে কি পারবে? মনে-মনে কথাটা বদলে নিয়ে আস্তে বললো, 'আপনাদের স্-স্-স্—' না, হ'লো না, সিঁড়িটাও বাদ—হঠাৎ তার মনে এলো, মুখে এলো, 'আপনাদের দরজায় যে-রকম একটা জন্তু বাঁধা থাকে—'

'জন্তু বাঁধা থাকে! বলো কী হে!' তন্ময়ের পিঠে চাপড় দিয়ে হা-হা হেসে উঠলো সতীশ। 'বেশ কথা বলো তো তুমি! তা তুমি এসো—জন্তুটা তোমাকে ভক্ষণ করবে না।'

তন্ময় তাজ্জব বনলো। সে তো কথাই বলতে পারে না—আর সে নাকি 'বেশ' কথা বলে! যাঃ!

কোঁচার খুঁট গায়ে, হাতে চায়ের পেয়ালা; নিবারণবাবু আস্তে বাইরের উঠোনে এসে দাঁড়ালেন।—'এই তো স্কুল থেকে এলি তনু, এখন আবার বই কী। একটু বেড়িয়ে আয়, একটু খেলাধুলো কর।'

লণ্ঠনের চিমনি সাফ করতে-করতে ভিতর থেকে ব'লে উঠলেন অনসূয়া—'ঐ তো! দিন-রাত্তির অক্ষর গিলছেন ব'সে-ব'সে, ছেলে আমার জজ হবে! এদিকে শরীর তো দড়ি পাকিয়ে গেলো। বেরো! খেলতে যা!'

'কী বদভ্যাস বাপু!' আরো একটু দূর থেকে ঝাঁঝিয়ে উঠলেন ব্রজসুন্দরী, অনসূয়ার মা। 'সকাল নেই, সন্ধে নেই, বই বুকে ক'রেই আছে ছেলে! বুড়ো ঠাকুর্দা!'

নিবারণবাবু নিচু গলায় বললেন, 'যা না, একটু ঘুরে-টুরে আয়।'

চকিতে চোখ তুলে তন্ময় বললো, 'যাই, বাবা।' আর দু-পৃষ্ঠা হ'লেই চ্যাপ্টারটা শেষ। তার পরেই সে যাবে—বড়ো দিঘি ধরতে নদীর আর কত বাকি দেখে আসবে একবার।

আর-কিছু না-ব'লে নিবারণবাবু চায়ের পেয়ালাটি হাতে ক'রে ভিতরে চ'লে গেলেন। টিনের ঘর, বড্ড গরম এই বিকেলবেলাটায়, ভিতরের উঠোনটাও তেমন খোলা না,

আর ভিতরে তো সেই এটা-ওটা-সেটার সংসার। ছেলের সঙ্গে আরো দু-একটা কথা বলার ইচ্ছে ছিলো, কিন্তু তন্নু একবারের বেশি চোখ তুললো-না। থাক।

হাতল-ভাঙা চেয়ারটায় ব'সে ছোটো-ছোটো ইংরেজি অক্ষরগুলির উপর তন্ময় আরো ঘন হ'য়ে ঝুঁকে পড়লো। হঠাৎ পিঠের উপর—উঃ! প'ড়ে যেতে-যেতে সামলে নিলো সে।

ভোঁশলা হী-হি ক'রে হাসছে দাঁড়িয়ে। তন্ময়ের বাবার চেয়েও লম্বা, দিদিমার চেয়েও মোটা, মস্ত জোয়ান গন্ধমাদন ভোঁশলা, ইন্সপেক্টর রেবতীবাবুর ছেলে। 'ঈশ! খুব-যে রাস্তার ধারে বই পড়ছিস ব'সে-ব'সে। বিদ্যে দেখানো হচ্ছে, অ্যাঁ?' ব'লে ভোঁশলা একটানে তন্ময়ের হাতের বই কেড়ে নিলো। 'লেস মিজারেবলস,' একটু চেষ্টা ক'রে নামটা পড়লো সে।

'লে মিজেরাবল,' তন্ময় না-ব'লে পারলো না।

'কী? লে? লে কেন? S-টা যাবে কোথায়? চালাকি! ভোঁশলা মোটা-মোটা আঙুলে পাৎলা কাগজের কয়েকটা পাতা উল্টিয়ে গেলো। 'এঃ, খুব তো চালাক তুই!' বড়ো-বড়ো চারটে দাঁত বের ক'রে হেসে বললো, 'এমনভাবে ব'সে ছিলি যেন সত্যিই পড়ছিস!'

'স্-সত্যিই মানে?'

'আহা, ন্যাকা! পারিস নাকি তুই এত বড়ো শক্ত ইংরিজি বই পড়তে?'

'ক্-ক্-ক্-ক্—' কিন্তু 'কী'টা বেরোলো না, মুখ-চোখ খামকা লাল হ'লো।

'এই ক'রে-ক'রেই বাবাদের কাছে বাহবা নাও তুমি! চোর!'

'না, আমি চোর না! তুমি—তুমি—'

'চুপ!' গ'র্জে উঠলো গন্ধমাদন। তন্ময়ের উদাহরণ বাড়ির পাশেই থাকাতে বাবার কাছে নির্যাতন তার বেড়েই চলছিলো, তারই ঝাল ঝাড়বার চমৎকার সুযোগ সে ক'রে নিলো।

'তুমি—তুমি—তুমি—' ভোঁশলার উপযুক্ত কোনো বিশেষণ তন্ময় খুঁজে পেলো না, আর পেলেও সেটা উচ্চারণ করতে কি পারতো?

'চুপ! আর একটি কথা বলবে তো দেবো বই ছিঁড়ে!' দুই পালোয়ানি হাতে ঠিক মাঝখানে খোলা বইটাকে ভয়ংকর ভঙ্গিতে দু-দিক থেকে টেনে ধরলো ভোঁশলা।

তন্ময় চেঁচিয়ে উঠলো, 'আমার বই! আমার বই!'

'আগে বল যে তুই পড়তে পারিস না, লোক দেখাস!'

'দাও!' তন্ময় ঝাঁপিয়ে পড়লো বইয়ের উপর, কিন্তু

কোথায় বই! তার হাতের নাগালের বাইরে, অনেক, অনেক উঁচুতে।

'আগে বল!'

'দাও, বই দাও আমার।'

'কী আশ্চর্য! আমি ঠাট্টা করছিলাম তোমার সঙ্গে তাও বোঝোনি? এই নাও।' হঠাৎ ভোঁশলা একেবারে অন্য মানুষ হ'য়ে গেলো, কুঁকড়ে ছোটো হ'য়ে কেমন দইয়ের মতো জোলো হ'য়ে গেলো, গলা দিয়ে আওয়াজই বেরোয় না। তন্ময়ের তাক লাগলো, কিন্তু কারণটা বুঝতে পারলো তখনই।

নিঃশব্দে ভোঁশলার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন তার বাবা। বিরাট পুরুষ, অত বড়ো-যে ভোঁশলা, তাকে পকেটে পুরতে পারেন। তাঁকে দেখে তন্ময়ের বুক কেঁপে উঠলো। হায় হায়, ভোঁশলা আজ গেছে!

'আবার ষণ্ডামি শুরু করেছো!' কথাটা আস্তেই বললেন রেবতীবাবু, কিন্তু সে-আস্তেটাই ভীষণ। 'অনেকদিন ওষুধ পড়ে না তোমার। এসো।'

তন্ময়ের আলজিভ পর্যন্ত শুকিয়ে গেলো। চোখ দিয়ে সে বলতে চেষ্টা করলো—পালা! পালিয়ে যা! কিন্তু ভোঁশলা মন্ত্র-পড়া সাপের মতো বাপের পিছন-পিছন ঢুকলো গিয়ে বাড়িতে।

ছুটে ভিতরে এসে মা-কে জড়িয়ে ধরলো তন্ময়।

'কী? কী রে?'

'ভোঁশলা! ভোঁশলাকে মেরে ফেলবে ওর বাবা!'

'কী? হয়েছে কী?'

'বাবা, ও বাবা, শিগগির—শিগগির যাও—ভোঁশলাকে মেরে ফেললো!'

ঠিক তখনই একটা বিকট চীৎকার পাড়ার হাওয়া থেঁৎলে দিলো। 'বা-বা—!' আর বলতে পারলো না তন্ময়, মা-র পিঠে মুখ চেপে কাঁপতে লাগলো।

একটানা শোনা যেতে লাগলো ভোঁশলার ষাঁড়ের মতো চীৎকার, আর মাঝে-মাঝে শপাশপ্ হান্টারের শব্দ। থামলো যখন, সারা পাড়া হঠাৎ একদম চুপ, থমথমে গম্ভীর হ'য়ে গেলো।

নিবারণবাবুও কাঁপছিলেন। মাসে অন্তত একবার এ-কাণ্ডটি ঘটবেই। রেবতীবাবুর এই এক পাগলামি—ছেলের উপর রাগ হ'লো তো মাথায় খুন চাপলো। আর ছেলেটাও—তা ও-রকম মারলে ছেলে আর কী হবে। প্রথম-প্রথম তিনি ছুটে যেতেন, পাড়ার বিপিনবাবু, নলিনাক্ষবাবুও আসতেন—কিন্তু কারো কথাতেই কিছু হয় না, যতক্ষণ মারের নেশা থাকে, অন্ধের মতো হান্টার চালিয়ে যান রেবতীবাবু, আর ছেলেটা জানোয়ারের মতো

গড়িয়ে-গড়িয়ে চ্যাঁচায়, আর ছেলের মা নিশ্চিন্তে রান্না করেন, ভাইবোনগুলি হাসে। কী যে—ছি!

মনের ভাব অস্ফুটে তিনি প্রকাশ ক'রে ফেললেন—'ছি!'

'রাখো তো বাপু তোমাদের ধুকপুকানি,' নিজের গায়ে তালপাখার হাওয়া দিতে-দিতে ব্রজসুন্দরী বললেন, 'না-মারলে কি ছেলে মানুষ হয়! আমার সাত হাত লম্বা-লম্বা ভাইগুলি বাবার হাতে মার খেতে-খেতে অজ্ঞান হ'য়ে গেছে এক-একদিন। তাতে হয়েছে কী, বলো? সেই সব ভাই-ই আজ লক্ষপতি! কিছু হ'লো না শুধু সতুটার—সবার ছোটো ব'লে ও মারও খায়নি, আবার বই শুঁকেই দিন কাটাতো—তোমাদের ঐ গোবরগণেশটার মতোই!' পাখার ডাঁট দিয়ে নাতির দিকে তিনি দেখালেন।

'তোমাদের দিনকাল তো আর নেই, মা,' রান্নাঘরের দিকে যেতে-যেতে অনসূয়া থমকে দাঁড়ালেন। 'আজকাল এ-সব মারধোর কারুরই ভালো লাগে না। আর আমার ছেলেকে তুমি ও-রকম ক'রে বোলো না তো!'

'অনি!'

এই একটিমাত্র আওয়াজেই নিবারণবাবু তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে গায়ে একটা জামা চড়িয়ে বেরিয়ে গেলেন। পাশের বাড়ির ছেলে-চাবকানোর মতোই এ-বাড়ির এটি

নিয়মিত ঘটনা। অন্ধকার-হ'য়ে-আসা, মশা-ভ্যান-ভ্যান-করা ঘরের মধ্যে একলা ব'সে-ব'সে তন্ময় আবার শুনলো— যে-সব কথা জ্ঞান হবার পর হাজার বার সে শুনেছে। দিদিমা অনর্গল ব'লে চললেন তাঁর ভাইদের ঐশ্বর্যের গল্প— তারা তো তাঁকে নেবার জন্য সাধাসাধিই করে, তবু আধপেটা খেয়েও এখানে প'ড়ে আছেন শুধু মায়া কাটাতে পারেন না ব'লেই—একটাই মেয়ে, একটাই সন্তান তাঁর—স্বামী ম'রে গেছে কবে কোন জন্মে, তা হোক, এখনো শ্বশুরের কত বড়ো বাড়ি নিতাইগঞ্জে, গেলে কি আর ঠেলতে পারবে তাঁকে, বছরে পঞ্চাশ টাকা তো পাঠাচ্ছে এখনো। আর এই-যে ছেলে-ছেলে ব'লে দেমাক করিস, এ-ছেলে থাকতো কোথায়, যদি আমি না থাকতুম! ওর জন্মের পর এক বছর তো বিছানা ছাড়তে পারিসনি! ভাইয়েরা তো তখনই বলেছিলো, মেয়ের বাড়িতে প'ড়ে থেকো না দিদি, ভালোও দেখায় না, সুখও হয় না। আমরা থাকতে ভাবনা কী তোমার! কিন্তু আমি তো মায়া কাটাতে না-পেরে…

কথা আর থামে না, এক কথা, পঞ্চাশ বার এক কথা। মা রান্নাঘরে অদৃশ্য ও নিঃশব্দ, আর বাবা তো সাড়ে-আটটার আগে ফিরছেন না। তন্ময় কী করবে? সে একা, সে ছোটো—কী করতে পারে সে? বিশ্রী, বিশ্রী সব:

স্কুল বিশ্রী, বাড়ি বিশ্রী, ভোঁশলা বিশ্রী, ভোঁশলার চেয়েও বিশ্রী ভোঁশলার বাবা; আর সবচেয়ে বিশ্রী দিদিমা। এই অন্তহীন বিশ্রীর মধ্যে মশা-ডাকা ঘরে কেরোসিনের গন্ধমাখা লণ্ঠনের সামনে তাকে ব'সে থাকতে হবে মুখ বুজে। ঈশ্বর, মুক্তি দাও! হে ঈশ্বর, মুক্তি দাও!

রাত্তিরে খাবার সময় পর্যন্ত বাড়ি থমথমে থাকলো। সরু বারান্দায় খেতে বসলো বাপ আর ছেলে; জলচৌকির উপর লণ্ঠন, উঠোনে ছায়া পড়ছে কেঁপে-কেঁপে। মা খাবার নিয়ে এলেন রান্নাঘর থেকে; তাঁর চোখ দেখে তন্ময় বুঝলো তিনি কাঁদছিলেন। রাগ হ'লো তার মা-র উপর। দিদিমার কথা—তাতে আবার কাঁদে!

দিদিমাটি জমকালো হ'য়ে ব'সে ছিলেন বারান্দারই এক ধারে মাদুর পেতে; মস্ত শরীর নিয়ে ন'ড়ে-চ'ড়ে উঠে দাঁড়ালেন এবার।—'সর, অনি।'

'তুমি আবার কেন—' বাঁ হাতের কব্জি দিয়ে অনসূয়া মাথার কাপড়টা একটু টেনে দিলেন।

'তুইও ব'সে যা—'

'না মা, তোমাকে আবার স্নান করতে হবে রাত্তির ক'রে—'

'যা গরম! ছুটো ডুব দিলে জুড়োবে। সর তুই—'
ব্রজসুন্দরী প্রায় ঠেলেই দিলেন মেয়েকে।

স্বামী-পুত্রের সঙ্গে একটু সসম্মান ব্যবধান রেখে অনসূয়া অগত্যা ব'সে পড়লেন। ব্রজসুন্দরী দিচ্ছেন; আর মাথা নিচু ক'রে নিঃশব্দে খাচ্ছে বাড়ির অন্য তিনটি প্রাণী।

খাওয়া যখন প্রায় শেষ, ব্রজসুন্দরী হাত ধুয়ে উঠে দাঁড়ালেন। 'উঠো না তোমরা,' ব'লে নিজের ঘরে অদৃশ্য হলেন, ফিরে এলেন একটি পাথরবাটি হাতে ক'রে। বাটি নামিয়ে, পিতলের নিরিমিষ হাতাটি রাজদণ্ডের মতো ধ'রে, নিচু মোড়াটিতে সম্রাজ্ঞীর মতো বসলেন।

'ও মা! এ কী করেছো, মা!' অনসূয়া ব'লে উঠলেন।

'কিছু না রে,' ব্রজসুন্দরীর গোল-গোল গালে হাসি ঝরলো। 'নাও, পাত পরিষ্কার করো সব।'

'এ তোমার ভারি অন্যায় মা, নিজের দুধ দিয়ে—'

'চুপ কর তো বাপু—'

'আমাকে বললে না কেন? আমি তোমাকে ক'রে দিতাম।'

'ও, আমিই বুঝি তোদেরটা সব খেয়ে ফেলি! আর আমারটা সবই ক'রে দিতে হয় তোকে, না?'

'না মা, তা না,' অনসূয়া ঢোঁক গিললেন। 'দাও, দাও, দেখি একটু।' আঙুলের ডগায় জিভে একটু ছুঁইয়েই ব'লে উঠলেন, 'বাঃ, চমৎকার হয়েছে তো।'

'খুব ভালো,' প্রতিধ্বনি করলেন নিবারণবাবু।

'তুমি তো এখনো খাওনি!' ব্রজসুন্দরী হেসে ফেললেন।

'ঐ! দেখেই বোঝা যায়!' হঠাৎ নিবারণবাবুর উপস্থিত-মতো কথা জুগিয়ে গেলো। 'ছানার পায়েস! বাঃ!'

ব্রজসুন্দরীর হাসি ছড়িয়ে পড়লো এক কান থেকে আরেক কানে। জামাইয়ের পাতে ভরা-ভরা দু-হাতা দিয়ে নাতির দিকে বাড়াতেই সে ব'লে উঠলো, 'অল্প।'

'আহা আমার বুড়ো কত্তা রে! খা বেশি ক'রে—পেটে গেলে গুণ দেবে!' গবগব ক'রে একেবারে অনেকখানি পায়েস ঢেলে দিলেন।

তন্ময় চট ক'রে একবার চোখ তুললো; তিন আঙুলের সাহায্যে বার চারেক একটু-একটু মুখে তুলেই থেমে গেলো।

'কী হ'লো?'

'আ-আর খাবো না।'

'আর মানে? খেলি কোথায়?'

'আর পারি না।'

'খা!' অনসূয়া তাড়াতাড়ি বললেন, 'খুব ভালো হয়েছে।'

'না।'

'কী? পাতে ফেলবি?' ব্রজসুন্দরীর স্বর বজ্রগম্ভীর।

তন্ময় চুপ।

'খাবি না তাহ'লে?' ব্রজসুন্দরীর ফর্শা মুখ টকটকে।

'ন্-না।'

'খাবি না?'

'না।'

'থাক না, খেতে যখন চাচ্ছে না—মিছিমিছি—' নিবারণবাবু একটুখানি মাথা তুলতে গিয়েই ফশ ক'রে আবার নামিয়ে ফেললেন।

'মিছিমিছি!' থান ধুতির আঁচলটি কোমরে জড়িয়ে নিলেন ব্রজসুন্দরী। 'আর এই দুধ—চিনি—দুপুরের গরমে আমার খাটুনি—এগুলি মিছিমিছি হ'লে বুঝি কিছু না! বলি হে নিবারণচন্দ্র, খুব কি পয়সা হয়েছে তোমার? ফেলতে-ছড়াতে আর গায়ে লাগে না? রাজভোগ খেয়ে মানুষ তোমার ছেলে, দিদিমার হাতের তৈরি পায়েস কি আর রুচবে তার মুখে! ভালো, ভালো!'

ব্রজসুন্দরীর মুখের কথা শেষ হ'তে পারলো না, অনসূয়া ঝংকার দিলেন সঙ্গে-সঙ্গে: 'অসভ্য ছেলে! দিন-দিন ইঁদুরের মতো চেহারা হচ্ছে—এদিকে খেতে ব'সে খাবেন না! লজ্জাও করে না ফেলতে! খা শিগগির!'

'না,' এবার তন্ময়ের উচ্চারণ সব বারের চেয়ে স্পষ্ট।

'না! বেয়াদব বাঁদর—!' আর কথা না-ব'লে অনসূয়া

বাঁ হাত বাড়িয়ে ঠাশ ক'রে এক চড় বসিয়ে দিলেন ছেলের গালে।

নিবারণবাবু জল খেতে গিয়ে খকখক কেশে উঠলেন, জলের গ্লাশ নামিয়ে রেখে উঠে গেলেন কোনোদিকে না-তাকিয়ে। আর, একটু পরেই তন্ময় উঠে পড়লো বেশ শান্তভাবেই। চড় খেয়ে দুঃখ হয়নি তার, রাগও না, বরং ভালোই লেগেছে, মনে-মনে খুশিই হয়েছে একটু। এ-চড়টা মা তো আর তাকে মারেননি, মেরেছেন দিদিমাকেই।

টিনের ঘরটি দুটি অংশে ভাগ করা; বড়োটি মা-বাবার, আর সেখানেই, দুটো জানলার কোণে তন্ময়ের পড়ার টেবিল। খেয়ে উঠেই সে খুলে বসেছে বই—ভূগোল। মন যখন ভালো থাকে না, তখন গল্পের বই ইচ্ছে করে না, ভূগোল-টুগোল বেশ লাগে।

বর্মা চুরুটের গন্ধে সে মুখ তুললো।

'লণ্ঠনটায় তেল নেই নাকি?' নিবারণবাবুর ভাবটা একটু অপ্রস্তুত-মতো, লাজুক-লাজুক। সলতেটা উশকে দিয়ে বললেন, 'কম আলোয় পড়া ভালো না।'

'বাড়ালে ধোঁয়া হয়,' তন্ময় বললো।

লণ্ঠনটার দিকেই চোখ রেখে নিবারণবাবু বললেন,

'রেবতীবাবুর সঙ্গে দেখা হ'লো তখন। ভোঁশলা বুঝি তোকে বিরক্ত করছিলো খুব?'

'না! ন্‌না তো! ক্‌ক্‌কিচ্ছু না!'

'আমি বললাম রেবতীবাবুকে—তা উনি তো ঐ একরকম মানুষ। তোর বইটা ছেঁড়েনি তো রে?'

'না।'

নিবারণবাবু আর যেন ভেবে পেলেন না কী বলবেন। চুরুটে দুটো টান দিয়ে হঠাৎ ব'লে ফেললেন, 'আর-কোনো বই চাই তোর? নতুন বই-টই?'

চাই কিনা? চাওয়ার কি অন্ত আছে তার? কত বইয়ের সে নাম জপে—আহা, যদি পড়তে পেতো, যদি চোখেও দেখতে পেতো! আর, সে নাম জানে ক-টা বইয়েরই বা, লে মিজেরাবল-এর নামই কি শুনেছিলো কোনোদিন! বইখানা তাকে পাঠিয়েছিলেন কলকাতা থেকে সতু-দাদা—দিদিমার সেই ভাই, ছেলেবেলায় মার না-খাওয়ার জন্য যার কিছু হ'লো না। ভালো তো তিনি, খুব ভালো; নিজে যে ভালো না, সে কি অত ভালো বই পাঠাতে পারে? এ-রকম কত আছে আরো! কিন্তু পাবে কোথায়।

'বাবা,' হঠাৎ মুখ তুলে চকচকে চোখে সে বললো, 'আমার ইচ্ছে করে মস্ত একটা বইয়ের দোকানে গিয়ে নিজে বেছে-বেছে বই কিনি।'

'বেশ তো, বড়ো হও, সবই হবে। এখন চাই না কিছু?'

'এখানে কিছু পাওয়াই যায় না।'

'ফার্ডিনাণ্ড সাহেবের বাড়িটা নদীতে ধরেছে—জিনিশ-পত্র নিলেম ক'রে দিচ্ছে ওরা। যাবি একদিন? বই-টই থাকতে পারে।'

'যাবো, বাবা। কবে?'

মনে-মনে মাসকাবারের হিশেব ক'রে নিবারণবাবু বললেন, 'আর চার-পাঁচ দিন পরে।'

'বাবা!' হঠাৎ কী বলতে গিয়ে তন্ময় থেমে গেলো।

'কী রে?'

বলবে? কতদিন ধ'রে মনে-মনে ভাবছে—বলতে গেলে লজ্জায় ম'রে যায়। কিন্তু আর তো পারাও যায় না—রাত্তিরে শুতে হবে ভাবতে কান্না পায়। না, দিদিমার সঙ্গে আর সে শুতে পারে না—দিদিমা দোক্তা খান, দিদিমার নাক ডাকে, আর···আর সবচেয়ে বিশ্রী, দিদিমা তার গায়ের গেঞ্জিটা জোর ক'রেই ছাড়িয়ে দেবেন রোজ। খালি গায়ে শুতে বিশ্রী লাগে তার, অসম্ভব বিশ্রী—কিন্তু দিদিমা তো শুনবেন না!···বলবে? কেন বলবে না—নিশ্চয়ই, আজই বলবে!

'কী?'

'বাবা, আমি—আমি—'

'কী? বল না!'

'বাবা, আমি একা শোবো।' ব'লেই তন্ময়ের মনে হ'লো ছুটে বাইরে চ'লে যায়।

কথাটা শুনে নিবারণবাবুর মুখও একটু ফ্যাকাশে হ'লো। 'তা—তা—বেশ—একটা ব্যবস্থা করা যাবে,' ব'লেই তিনি বিছানায় গিয়ে বালিশে কাৎ হলেন।

তন্ময় পড়ায় মন দিলো। কাল স্কুলের পড়া দক্ষিণ আমেরিকার ভূগোল। আর্জেন্টিনা—বুএনস এআরিস; ব্রেজিল—রিও ডি জেনেইরো; পেরু—লিমা; চিলি—সান্টিআগো; ইকুএডর—কুইটো। কী সুন্দর নাম রে দেশের! আর্জেন্টিনা, সান্টিআগো, ইকুএডর: যেন ঝকঝক রোদ্দুর। পেরু, লিমা, চিলি: বেড়ার ফাঁকে ঝিলমিল রোদ। এই টিনের বাড়িটা ভালো না, আগে তারা ছিলো একটা বেড়ার ঘরে, ফাঁকে-ফাঁকে লম্বা-লম্বা রোদের তীর ছুটে আসতো ভোরবেলা—আর্জেন্টিনা আর সান্টিআগো ঠিক সেইরকম; আর পেরু আর লিমা যেন বেড়ার গায়ে আলোর গোল-গোল চাকতি। পেরু, লিমা; চিলি, সান্টিআগো; ইকুএডর, কুইটো। ব্রেজিল, ব্রেজিল···চকচকে নতুন একটা টাকা। বুএনস এআরিস···হাওয়া, খোলা হাওয়া, মাঠের মধ্যে হাওয়া। যাওয়া যায় না? যাওয়া যায় না সে-সব দেশে,

যেখানে দিদিমার কাছে শুতে হয় না, যেখানে ইচ্ছেমতো খাওয়া যায়—কি না-খাওয়া যায়, সেই সব ঝকঝকে ঝলমলে ঝিলমিল দেশ—ব্রেজিল, ঝিলমিল।

সদাই আমার চোখে করে ঝিলমিল
নতুন টাকার মতো সুন্দর ব্রেজিল।

বোঁ ক'রে উঠলো মাথার মধ্যে।

ব'সে-ব'সে ভাবি কিছু পাই বা না পাই
আমি যেন কোনোদিন সেই দেশে যাই।

আরো দু-লাইন। ভূগোলের বই সরিয়ে রেখে নীল মলাটের বাঁধানো খাতাটি টেনে নিলো, দোয়াতে কলম ডুবিয়ে তাড়াতাড়ি লিখতে লাগলো :

সদাই আমার চোখে করে ঝিলমিল
নতুন টাকার মতো সুন্দর ব্রেজিল।
ব'সে-ব'সে ভাবি, কিছু পাই বা না পাই,
আমি যেন কোনোদিন সেই দেশে যাই।
এখানে লাগে না ভালো এ যেন জঙ্গল,
ঘিরিয়া বসিয়া আছে শ্বাপদের দল।

ঐ শ্বাপদটা হ'লো দিদিমা! বেশ! তন্ময়ের মুখে হাসি ফুটলো।

এখানে আঁধার রাত্রি—

শুধু রাত্রি না, দিনও—

এখানে আঁধার রাত্রি, দিবা হেথা কালো,
কোনো ফাঁকে নাহি পশে—

আলো তো নিশ্চয়ই—কিন্তু কিসের? প্রভাতের? দিবসের? অরুণের? তপনের? তপনটাই ভালো। কিন্তু শুধু তপন কেন—রাত্তিরেও তো চাঁদ আছে, তারা আছে। হ্যাঁ—আকাশের, আকাশের আলো। ঠিক!

কোনো ফাঁকে নাহি পশে আকাশের আলো।
এখানে বন্দিনী আমি—

ছন্দের জন্য বন্দিনীই হ'তে হ'লো—উপায় কী—

এখানে বন্দিনী আমি, ঘোর অন্ধকার,
অবিরাম চিত্ত মোর করে হাহাকার।
ব'সে-ব'সে ভাবি যদি যেতে পারি সেথা,
যে-দেশে বাতাস করে আনন্দ অযথা,
যে-দেশে—

এইবার নীল চাই একটা—

যে-দেশে উজ্জ্বল রোদ, আকাশ সুনীল
নতুন টাকার মতো—

না, অন্য কিছু—

সকালে সূর্যের মতো সুন্দর ব্রেজিল।

বাঃ!

সমস্তটা পড়লো ছু-তিনবার ঈষৎ ছুলে-ছুলে, ঠোঁট নেড়ে-নেড়ে। ভালো হয়েছে! খুব ভালো! আরো লিখতে ইচ্ছে করছে—অনেক, অনেক! ঈশ, এ-খাতাটাও ভ'রে এলো প্রায়।

ততক্ষণে অনসূয়া অনেক যত্ন ক'রে মা-কে খাইয়েছেন, মামাদের গল্প ক'রে মন ভিজিয়েছেন; বেশ খোশমেজাজে শুতে গেছেন তিনি। মা-র বাসনকোশন ধুয়ে রেখে আঁচলে হাত মুছতে-মুছতে অনসূয়া ঘরে এলেন।

—'তন্নু, যা, শুতে যা এবার।'

'যাই।'

'দেরি করিস না, দিদিমা ডাকছেন।...আর শোন, দিদিমা গুরুজন, তাঁর সঙ্গে ও-রকম করতে হয় না,' ছেলের মাথাটা বুকের কাছে টেনে নিলেন মা।

তন্ময় চট ক'রে মাথা সরালো। কী-যে মা—সে কি বাচ্চা আছে নাকি এখনো? খাতা বন্ধ ক'রে উঠলো, কিছু না-ব'লে চ'লে গেলো শুতে। দিদিমার আর দোষ কী, তিনি যে-রকম, সেইরকমই তো তিনি হবেন। 'সকালে সূর্যের মতো সুন্দর ব্রেজিল।' সুন্দর!

২

পড়ন্ত রোদে ঝকঝকে শনিবারের বিকেল। শুড়কির লাল রাস্তায় উঁচু-উঁচু ঝাউয়ের ছায়া, আর হাওয়ার কী শোঁ-শোঁ আওয়াজ সমস্ত পথ জুড়ে! নোয়াখালির সবচেয়ে সুন্দর ঝাউ-ছাউনির এই রাস্তা; সোজা কোর্টের দিঘি থেকে নদীর ধার পর্যন্ত; নদী যখন আরো দূরে, আরো কত লম্বা ছিলো, বছর-বছর ছোটো হ'য়ে-হ'য়েও এখনো কম কী! টাউন হল, পোস্টাপিশ, জুবিলি স্কুল, এস. ডি. ও.-র কুঠি—এ-সব পেরিয়ে এখন এসে মুখ থুবড়ে পড়েছে নদীর গায়ে: খাড়া পাড়, ফাটা মাটি, থেকে-থেকে চাক ধ্ব'সে পড়ার ঝুপঝুপ শব্দ, ঘুরপাক ঘোলা জল, মুখে ফেনা তুলে শহর গিলে খাচ্ছে। আহা, ফার্ডিনাণ্ড সাহেবের ছবির মতো বাংলো—তাও গেলো।

ঝাউয়ের রাস্তা থেকে ডান দিকে একটু বেঁকে চাঁপা-গাছের ছায়া-পড়া ছোট্ট গেট দিয়ে তন্ময় ঢুকলো তার বাবার সঙ্গে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে লাল মোটরগাড়িটা—শহরের

একমাত্র মোটরগাড়ি—সোনাপুর থেকে পুলিশ-সাহেবও এসেছেন তাহ'লে। তন্ময় বুঝলো বাবা একবার ঢোঁক গিললেন, আর তাকে লুকিয়ে ফেলে দিলেন হাতের চুরুটটা—ভাগ্যিশ ওটা ফুরিয়েও এসেছিলো প্রায়! ও-সব হোমরাচোমরাদের দেখলে, কি তাঁরা কাছাকাছি আছেন জানতে পারলে, এমনকি তাঁদের নাম শুনলেও বাবা যেন কী-রকম হ'য়ে যান। কেন? ওঁরা কি খুব খারাপ লোক? কই, দেখতে-শুনতে তো ভালোই। আর খারাপ হ'লেই বা বাবাকে করবে কী—বাবা তো ভালো! উনি না-হয় সুপারিনটেনডেণ্ট অব পুলিস-ই আছেন আর বাবা না-হয় সব-ইন্সপেক্টর থেকে ইন্সপেক্টরই হ'তে পারলেন না এতদিনে; দু-জনেই তো মানুষ! বাবার এই ভয়ের ভাবটা বিশ্রী লাগে তার; এক-এক সময় মনে হয় কিছু বলে, কিন্তু—কিন্তু বাবাকে আবার বলা যায় নাকি কিছু—দূ—র!

শহর ছাড়িয়ে, নদীর ধারে, ছায়া-ঢাকা একলা চুপচাপ যে-বাড়িটিকে এতদিন তন্ময় শুধু রাস্তা থেকে দেখেছে আর মনে-মনে তারিফ করেছে, আজ তার চওড়া আট ধাপ সিঁড়ি দিয়ে স্বচ্ছন্দে উঠে গেলো সে। সমস্ত বেচে দিয়ে চ'লে যাচ্ছেন ফার্ডিনাণ্ড সাহেব। খবর পেয়ে এই মাস-কাবারের প্রথম উজ্জ্বল শনিবারটিতে শহরের অনেকেই এসেছেন। অনেকেই মানে—এস. পি., এস. ডি. ও.,

সরকারি উকিল পরেশবাবু, গির্জের পাদ্রিসাহেব—সত্যিকার শাদা সাহেব তিনি, ফার্ডিনাণ্ড সাহেবের চেয়েও অনেক শাদা—আর এ ছাড়া শহরের খান পনেরো পাকা বাড়ির বাসিন্দাদের কেউ-কেউ। টিনের ঘরে খড়ের ঘরে যারা থাকে, তারা আবার সাহেব-বাড়ির জিনিশ কিনবে কী! বাবাও কি আসতেন? কিন্তু বই! এখানকার বইয়ের দোকানে ম্যাকমিলান্স রীডার আর সুনীতি-সোপান আর জর্জ দি ফিফ্‌থ-এর জীবনী ছাড়া আর-কিছু কি পাওয়া যায় ছাই!

সিঁড়ি দিয়ে উঠেই ঠাণ্ডা, কম-আলোর একটা হলঘর; সেখানে চকচকে কালো রঙের ভারি-ভারি টেবিল চেয়ার খাট, গায়ে-গায়ে দামের টিকিট লাগানো। পাশে লম্বামতো আলোভরা পশ্চিমের ঘরে চা-পেয়ালা, রুপোর থালা, চীনেবাসন, আর হরেকরকম লণ্ঠন মোমদানি ফুলদানি—তন্ময় না-তাকিয়েই পার হ'য়ে যাচ্ছিলো সে-সব, কিন্তু বাবা হঠাৎ থেমে গিয়ে খুব মন দিয়ে দেখতে লাগলেন ফুল-আঁকা Forget-me-not লেখা চায়ের পেয়ালাগুলি।

তন্ময় ডাকলো, 'বাবা, ঐ—ঐ ঘরে—'

বাবা বললেন, 'হুঁ।'

'ও-ঘরে বই আছে। ঐ যে দেখা যাচ্ছে—' তন্ময় আঙুল দিয়ে দেখালো।

কিন্তু বাবা পেয়ালা থেকে চোখ তুললেন না।

বা রে, ঐ চায়ের পেয়ালায় বাবা অত দেখছেন কী—ও-রকম তো আছে তাদের। 'চলো—' ব'লে বাবার হাত ধ'রে টানতেই তন্ময়ের চোখে পড়লো, পাশের ছোটো ঘরটির দরজার কাছে ন'ড়ে-চ'ড়ে বেড়াচ্ছেন এস. ডি. ও., এস. পি. আর এস. পি-র স্ত্রী। এই জন্য? বাবার উপর রাগ হ'লো তার: ইচ্ছে হ'লো বাবার পকেট থেকে ব্যাগটা নিয়ে একাই চ'লে যায় ও-ঘরে, কিন্তু কী ক'রে কিনবে, কার হাতে টাকা দেবে—সে নিজেই বাবার চেয়ে কম ভিতু নাকি!—আরো বেশি রাগ হ'লো নিজের উপর।

একটু পরে তাদের পাশ দিয়েই হেঁটে চ'লে গেলেন নোয়াখালির তিন মান্যবর। নিবারণবাবু তাঁদের যেন লক্ষ্যই করলেন না, শুধু একটু স'রে দাঁড়ালেন রুপোর বাসন ভরা আলমারিটার আড়ালে—তারপর হাঁফ ছেড়ে ছেলেকে নিয়ে ছোটো ঘরটায় ঢুকলেন।

ঘরটিতে আর-কেউ তখন ছিলো না। জিনিশও কম; দেয়ালে তু-খানা সমুদ্রের ছবি—বাইরে তাকালেই যা দেখা যায় তার জন্য আর ছবি কেন?—একটা সোনালি ফ্রেমের আয়না, আর টেবিলে শোওয়ানো স্কুলের প্রাইজ-ডিস্ট্রিবিউশনের মতো ফিতে-বাঁধা-বাঁধা কয়েক বাণ্ডিল বই। বড়ো ভালো লাগলো তন্ময়ের; স্বাধীনভাবে একটু

হেঁটে বেড়ালো ফাঁকা ঘরে, একবার এ-জানলায়, একবার ও-জানলায় একটু-একটু দাঁড়ালো, এমনকি দরজা পেরিয়ে বারান্দাতেও এলো, কিন্তু এসেই ফিরে গেলো, পাছে টুপ ক'রে জলের মধ্যে প'ড়ে যায়। বারান্দাটি শেষ হ'য়ে যেখানে সিঁড়ি থাকার কথা, সেখানে আহ্লাদে কলকল করছে সমুদ্রের মতো নদী, আর সমুদ্রের মতো নদীর বুকে যেন চোদ্দ হাজার আহ্লাদি ছেলে গাল ফুলিয়ে ফুঁ দিচ্ছে—এমনি হাওয়া! ঘরে এসে মস্ত খোলা শিকছাড়া জানলায় দাঁড়িয়ে তন্ময় মুখ বাড়ালো জলভরা ঝোড়ো হাওয়ায়, দেখলো রোদ্দুর-জ্বলা প্যাঁচালো রাগি থৈ-থৈ জল, আর ঐ জলঘেরা বারান্দায় রংকরা লোহার বেঞ্চিতে ফার্ডিনাণ্ড সাহেবের ছোটো ছেলেকে—খাতা-পেনসিল নিয়ে বোধহয় হিশেব লিখছে ঐ ছোট্ট উপদ্বীপটিতে নিরিবিলি ব'সে। এমন যদি হয় যে ঈশ্বর হঠাৎ নদীকে হুকুম করলেন, 'থামো, আর না!'—আর আজ থেকে, এই মুহূর্ত থেকেই নদী থেমে গেলো, আর ভাঙে না—তাহ'লে কী-মজা হয় এদের; যেন জলজ্যান্ত নদী থেকে উঠেছে, এমন বাড়ি আর একটাও তো নেই নোয়াখালিতে! কিন্তু নদী-যে আর ভাঙবে না এরা তা কী ক'রে জানবে?—তা-ই তো! মানুষ তো ঈশ্বরের আদেশ শুনতে পায় না—দেখে তো আর তক্ষুনি বোঝা যাবে না কিছু, জিনিশপত্র বেচে দিয়ে এরা

চ'লেই যাবে, তারপর যখন এক মাস দু-মাসেও নদী আর ভাঙবে না, তখন কেউ হয়তো চিঠি লিখবে এদের—কে লিখবে? কেউ কি জানে কোথায় চ'লে যাচ্ছে এরা?

'তন্নু, এদিকে আয়!'

'এসো না বাবা এখানে; ছাখো, ক্-কী সুন্দর!' ব'লে তন্ময় জানলা দিয়ে ঝুঁকলো।

'আহা-হা—ঝুঁকিস না ও-রকম!'

'স্-সবটাতেই তোমার ভয় কেন, বাবা?'

বাবা বললেন, 'আয়, বই দেখবি না?'

একা শুয়ে একখানা বই, দেখামাত্র ভালোবাসলো তন্ময়। অদ্ভুত নাম—EYES AND NO EYES। চ্যাপ্টা ছাঁদের বই, মোটাসোটা মিশকালো অক্ষর, ছবির ছড়াছড়ি—ফুলের, পাখির, গাছপালার জ্যান্ত রঙিন ছবি, আর কাগজের গন্ধ কী চমৎকার! নতুনের মতো ঝকঝকে। সাহেবরা খুব যত্ন নেয় বইয়ের, না কি পড়েই না?

'এটা নেবো, বাবা।'

'বেশ!' নিবারণবাবু মুখ তুলেই দেখলেন, তাঁর সামনে—ঠিক সামনে দাঁড়িয়েছেন এসে পুলিশ-সাহেব আর তাঁর স্ত্রী। সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর মুখ, চোখ, দাঁড়াবার ধরন, সব বদলে গেলো, কোমর থেকে সমস্ত পিঠটাকে সেমি-সার্কল-এর

মতো বাঁকিয়ে দিলেন, তারপর আর ভালো ক'রে সোজাই হ'তে পারলেন না।

মাছি তাড়াবার ধরনে হাতের একটুখানি ভঙ্গি ক'রে অভিবাদন গ্রহণ করলেন পুলিশ-সাহেব। একটু হাসলেনও। 'কী, আপনার জীনিঅস-ছেলের জন্য বই কিনছেন? বেশ, বেশ।'

তন্ময় লাল হ'লো। সে-যে কবিতা লেখে, এ-খবরটা শহরের কারোরই প্রায় জানতে বাকি নেই। দিদিমারই দোষ; বাড়ি-বাড়ি গিয়ে গল্প করবেন—আর বাড়িতে কেউ এলে কি আর রক্ষে আছে! একবার এই পুলিশ-সাহেবটি সশরীরে, সপরিবারে এসেছিলেন তাদের বাড়িতে—সে কী কাণ্ড! বাবার অবশ্য রা নেই, আর মা কথা বলার সুযোগ পেলেন কোথায়—দিদিমাই একশো! পুলিশ-সাহেব তো পুলিশ-সাহেব, দিল্লির ভাইসরয় কি স্বয়ং সম্রাট পঞ্চম জর্জ এলেও আগে নাতির বিদ্যের বড়াই ফলিয়ে তবে অন্য কথা! বেচারা পুলিশ-সাহেবকে অগত্যা বলতেই হ'লো—'কবিতা লেখো তুমি? আমার নামে একটা কবিতা লেখো দেখি, কেমন পারো?' দেখতে চান? দেখুন তাহ'লে! তক্ষুনি, তাঁরা ব'সে থাকতে-থাকতেই, তন্ময় বারান্দার কোণে ব'সে কবিতা বানিয়ে ফেললো ভদ্রলোকের নামে—মানে, প্রথমে নামের অক্ষরগুলি উপর থেকে নিচে সাজিয়ে ফেললো,

তারপর লাইন মিলিয়ে গেলো চটপট—এর চেয়ে সোজা আর কী। ছ-লাইনের প্রথম ছ-টি অক্ষর হ'লো সু-কো-ম-ল সে-ন; আর পুরোটার মানে এইরকম দাঁড়ালো যে সুকোমল সেন একজন সুন্দর, কোমল, মধুর, ললিত, সেবাপরায়ণ এবং নম্র মানুষ।—সত্যি কি উনি তাই?—কিন্তু কী আর করা যাবে, কবিতা লিখতে গেলে অমন বানানো কথা বলতেই হয়—তা ভাগ্যিশ ভদ্রলোকের নামটি নামের মানের মতোই মোলায়েম, একটা যুক্তাক্ষর কি একটা মুর্দ্ধণ্য 'ণ' থাকলেই হয়েছিলো!

কবিতাটি সেদিন হাতে-হাতে ঘোরাঘুরি করেছিলো, কয়েকটা 'বাঃ', 'বেশ' উচ্চারিত হবার পর কাগজখানা পকেটে পুরে খুশি মুখে সাহেব বলেছিলেন, 'তুমি দেখছি একটি জীনিঅস।'

এখন আবার ছেলের প্রশংসা শুনে বাবা কেমন ভয়ে-ভয়ে একটু হাসলেন, একবার কাশলেন, কিন্তু আর-কোনো আওয়াজ তাঁর বেরোলো না। সদয় সাহেব তাই তন্ময়কে লক্ষ্য ক'রেই আবার বললেন, 'কী-রকম, কবিতা-টবিতা লেখা হচ্ছে আজকাল?'

হঠাৎ তন্ময়ের ইচ্ছা হ'লো প্যাণ্ট-কোট-পরা লম্বা-চওড়া মহাপুরুষটিকে তাক লাগিয়ে দেয়। এখন সে অমিত্রাক্ষরে একটা মহাকাব্য লিখছে কর্ণের মৃত্যু নিয়ে, তু-দিনে তুটো

সর্গ লেখা হ'য়ে গেছে—এইটে একটা বলবার মতো কথা বটে! 'কর্ণকে নিয়ে একটা মহাকাব্য লিখছি এখন।' কিন্তু বলতে গিয়ে প্রথম 'ক'টাই আটকে গেলো। 'এখন একটা মহাকাব্য লিখছি,' 'একটা মহাকাব্য—', 'অমিত্রাক্ষরে একটা—'; ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বার-বার চেষ্টা করলো, গলার রগ ফুলে উঠলো, চোখে ঝাপসা দেখলো, কিন্তু না—কোনোটাই না, ভীষণ নিঃশব্দ পরিশ্রমের পর ব্যর্থ হ'য়ে সেও মাথা নিচু করলো, সেও যেন ধুলোয় মিশে গেলো তার বাবারই মতো।

সাহেব বললেন, 'এই জুল ভার্নের বই ক-টা নিয়ে যান, ভালো লাগবে আপনার ছেলের।'

নিবারণবাবু আর দেরি করলেন না; তক্ষুনি সাহেবের অনুমোদিত ছ-খানা বই চার টাকা দিয়ে, আর এক টাকা দিয়ে ছেলের মনোনীত বইখানা কিনে ফেললেন। বইগুলি তন্ময়ের হাতে দিয়েই কী-রকম একটা ভঙ্গি করলেন শরীরের—ভাবটা এই: আয় পালাই!

কিন্তু অত সহজে তিনি রেহাই পেলেন না। সাহেবের মুখ থেকে কথা লুফে নিলেন মেমসাহেব। থলথলে মুখে হাসি ফুটিয়ে তন্ময়কে বললেন, 'তোমার খুব রীডিং হ্যাবিট বুঝি? তা হেল্‌থ-এর কেন কেয়ার নাও না সে-রকম? হেলথ ইজ ওএলথ!'

তন্ময়ের মনে হ'লো তার দিদিমা হঠাৎ কয়েকটা ইংরিজি কথা শিখেছেন। বেজায় হাসি পেলো তার, ভয় হ'লো পাছে সত্যিই হেসে ফেলে—কথা বলতেই কষ্ট, হাসির তো বাধা নেই।

'এসো না একদিন আমাদের ওখানে,' মেমসাহেব আবার বললেন, 'কিছু খাবে-টাবে। আসবে?···মুখে যে কথা নেই? শাই বয়!'

সব-ইন্সপেক্টরের পুত্রকে এতখানি আপ্যায়ন ক'রে মেমসাহেব নিজের ভালোমানুষিতে ভারি খুশি হলেন, আর সাহেব ছোট্ট অস্ফুট একটুখানি 'Well' ব'লে যেই পা বাড়িয়েছেন, অমনি যেন তাঁরই পদপাতের প্রতাপে বাড়িটা যেন ভূমিকম্পে কেঁপে উঠলো, বাজ-পড়ার মতো প্রচণ্ড শব্দে একটুক্ষণ স্তম্ভিত হ'য়ে থাকলো সবাই। হঠাৎ মস্ত খোলা জানলাটা দিয়ে যেন আকাশ থেকে ছিটকে মেঝেতে পড়লো ফার্ডিনাণ্ড সাহেবের ছোটো ছেলে, শুড়কির আর জল্লের ধোঁয়ায় ঘর ভ'রে দিয়ে একটা বিরাট ঢেউ লাফিয়ে উঠে মিলিয়ে গেলো।

সকলের আগে শোনা গেলো মেমসাহেবের ছুঁচোলো চীৎকার: 'ওগো, কী হ'লো?'

'Holy Mother!' উঠে দাঁড়িয়েই উর্ধ্বশ্বাসে বাইরে ছুটলো ছোটো ফার্ডিনাণ্ড।

মেমসাহেবের হাত ধ'রে পুলিশ-সাহেবও দিব্যি দৌড় দিলেন। মুখের লোনা জলের ছিটে হাত দিয়ে মুছে ফেলে তন্ময় দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখছিলো আশ্চর্য দৃশ্য। এই একটু আগে যেখানে সুন্দর বারান্দাটি ছিলো, সেখানে এখন থৈ-থৈ করছে জল, থৈ-থৈ, হৈ-হৈ, হৈ-চৈ, কী-ফূর্তি জলের!—এই ঘর, যার একদিকে এখন দেয়ালের বদলে আকাশ, আর দূরের ঐ লম্বা বাঁকা ঝাপসা নীল—এ-দুয়ের মাঝখানে ছড়িয়ে আছে পড়ন্ত রোদে সোনার মতো জল, অস্থির, নিশ্চিন্ত, অফুরন্ত জল।

বেশিক্ষণ দেখা হ'লো না—হ্যাঁচকা টান পড়লো হাতে, বাবার সঙ্গে তাকেও ছুটতে হ'লো—ঈশ, কী-রকম কাঁপছেন বাবা!—কিন্তু আর কী, হ'য়েই তো গেছে।

ততক্ষণে সকলেই বাইরে, সকলেই সরব, কেউ কারো কথা শুনছে না। কী কাণ্ড! হোআট এ টে-রিবল অ্যাক্সিডেণ্ট! আর-একটু হ'লেই সো মেনি ভ্যালুএবল লাইভস—ফার্ডিনাণ্ডের ছেলেটা বেঁচেছে খুব···কী ট্রেচেরাস নদী···কথা ছড়ালো বাগান থেকে রাস্তায়, মুখ থেকে মুখে, দেখতে-দেখতে সারা শহরে। বাংলোর গেট পার হ'তে-হ'তে তন্ময় ফিরে-ফিরে তাকালো: চাঁপাগাছটির ছায়া আরো লম্বা হয়েছে, বাগানে হাসছে রঙিন ফুল, মাথা নাড়ছে গাছপালা, পাতা ঝরছে ঘনসবুজ ঘাসে। যাবে, এরাও যাবে,

আর মাত্র ক-দিন পরে এখানেও জল ছাড়া কিছু থাকবে না। কিন্তু গাছের ভয় নেই, ঘাসের ভাবনা নেই, ফুলের দুঃখ নেই—যে-নদী এদের গিলবে, সেই নদীর মতোই নিশ্চিন্ত এরা।

মোড় ঘুরে ঝাউয়ের রাস্তাটিতে আসতেই দেখা গেলো, বেশ ভিড়। এরই মধ্যে বাড়ি ধ্বংসে পড়ার খবর পেয়ে ছুটে আসছিলো লোকজন; কিছু হয়নি, একটাও মানুষ মরেনি, জখম পর্যন্ত হয়নি কেউ, এ-কথা শুনে কেমন দ'মে গেছে সবাই। কখনো তো কিছু ঘটে না এখানে, দিনের পর দিন একরকম; মাঝে-মাঝে যদি ম্যাজিস্ট্রেট বদল হয়, কি কোনো ফেআরওএল-পার্টিতে খাওয়ানো হয় লাকশাম জংশন থেকে আনানো বরফ লেমনেড, তা-ই নিয়ে বলাবলি ক'রে সাতদিন কাটিয়ে দেয় লোকেরা। নদীটা আছে ব'লে তবু বলবার মতো একটা কথা আছে—তাও তো রোজ এক কথা—আজ একটা খুব জোর খবর কিনা হ'তে-হতেও ভেস্তে গেলো! এখন জটলা ক'রে যেটুকু জীইয়ে রাখা যায়, সেটুকুই লাভ। সন্ধ্যার প্রথম ছায়া-লাগা গাছে-গাছে পাখির চ্যাঁচামেচির সঙ্গে পাল্লা দিতে লাগলো রাস্তায় মানুষের গলা।

কোনোদিকে না-তাকিয়ে, কোনো কথায় কান না-দিয়ে নিবারণবাবু ঊর্ধ্বশ্বাসে হাঁটছিলেন, যেন নদীটা পিছনে তেড়ে আসছে, যেন বিপদের সমুদ্র থেকে নিশ্চিত আশ্রয় আছে একমাত্র ঐ চোদ্দ টাকা ভাড়ার টিনের ঘরটিতে। এই তাড়াহুড়োটা মোটে ভালো লাগছিলো না তন্ময়ের; হঠাৎ তার নাম ধ'রে কে ডাকলো, দাঁড়াতে পেরে খুশি হ'লো।

এলোমেলো ভিড় থেকে একটু দূরে, রাস্তার ধারে দুটি ঝাউগাছের ফাঁকে একলা দাঁড়িয়ে আছেন শিবেনবাবু, তাদের ইংরিজির মাস্টারমশাই। তাঁকে দেখামাত্র তন্ময় প্রবলবেগে শরীর মোচড়াতে লাগলো। স্কুলের মাস্টার-মশাইদের মধ্যে মনে-মনে এঁকেই তার সবচেয়ে পছন্দ, এঁর কাছে লজ্জাও তাই সবচেয়ে বেশি। ছিপছিপে রোগা মানুষটি, ধবধবে ফর্শা, মাথার চুল লালচে-ভাবের, যেন তেল দেন না কখনো, পাড়ছাড়া ধুতি পরেন, চটি ছাড়া পায়ে দেন না, গায়ে শীতে-গ্রীষ্মে শাদা একটি চাদর জড়ানো। তাঁর মতো কম-বয়সের মাস্টার স্কুলে আর নেই; আর ও-রকম চেহারা, কাপড়চোপড়, চালচলন, উচ্চারণ সারা শহরেই আর আছে নাকি! প্রথম দিন থেকেই অবাক লেগেছে তন্ময়ের। এখানকার কোনো-কিছুর সঙ্গেই একটু মিল নেই তাঁর; আলতাফ আলির ছমছমে বাগিচায় একটা ঘর নিয়ে একলা থাকেন; পড়া ফেলে গল্প করেন ক্লাশে, আর

রাস্তায় চলতে-চলতে বিড়বিড় ক'রে নাকি পদ্য আওড়ান। তন্ময় ভেবেই পায় না এত দেশ থাকতে এই হতচ্ছাড়া নোয়াখালিতে তিনি ছিটকে পড়লেন কেমন ক'রে—তাঁর মতো মানুষকে কি এখানে মানায়!

'কী, বই কিনে আনলে ফার্দিনান্দের বাড়ি থেকে?'

'দেখুন তো কেমন বই।' বই সম্বন্ধে পুলিশ-সায়েবের চাইতে স্কুলমাস্টারের উপরেই নিবারণবাবুর আস্থা যেন বেশি।

'ভালো! ভালো!' একবার তাকিয়েই শিবেনবাবু বইগুলি ফেরৎ দিলেন। 'তা আপনারা ছিলেন, যখন বাড়ি ভেঙে পড়লো?'

'ঠিক সেই ঘরেই!' সেই ভীষণ মুহূর্তটি মনে ক'রে নিবারণবাবু আর-একবার কেঁপে উঠলেন।

'তন্ময়ের খুব ভালো লাগলো নিশ্চয়ই?'

'খ্-খুব।'

ছেলের মুখের এই 'খুব'টা নিবারণবাবুর ভালো লাগলো না, আর দাঁড়িয়ে না-থেকে আবার হাঁটতে লাগলেন। পাশে চলতে-চলতে শিবেনবাবু যেন আপন মনেই বললেন, 'পর্তুগিজ ফার্দিনান্দ—দুরন্ত জলদস্যুর জাত—সেই জলেই সব গেলো আজ।' একটু পরে, একটু যেন ভেবে নিয়ে বললেন, 'ইংরেজেরও যাবে।'

নিবারণবাবু সভয়ে চারদিকে তাকালেন। কেউ শুনে ফেললো না তো? এই শিবেনকে—তিনি জানেন—সি. আই. ডি. ভালো চোখে ত্থাখে না, কাছাকাছি একটা টিকটিকি থাকতে দোষ কী—আর আমারই বিরুদ্ধে একটা রিপোর্ট হ'য়ে যেতে কতক্ষণ! এদিকে মুশকিল—শিবেন তো সঙ্গে-সঙ্গেই চলেছে দেখি।

যেন ভীত কোর্ট-সবইন্সপেক্টরকে ভরসা দেবার জন্মই শিবেনবাবু অন্য কথা পাড়লেন: 'তন্ময় হাফ-ইআলিতে থর্ড হয়েছো।'

থর্ড! কী সুন্দর ক'রে বললেন কথাটা: 'আ' না, 'অ'ও না, মাঝামাঝি কেমন একটা। আর-কেউ বলে না ও-রকম, হেডমাস্টার মশাইও না। তন্ময় মনে-মনে ঐ আওয়াজটা দু-বার আওড়ালো, তারপর বাবার দিকে তাকিয়ে দেখলো তাঁর সেই লাল-মোটরটা-দেখা-ইস্তক ফ্যাকাশে-হ'য়ে-থাকা মুখটা এতক্ষণে জ্যান্ত দেখাচ্ছে।

নিবারণবাবু চোখ তুলে একবার মাস্টারটির দিকে তাকিয়ে তাঁর আনন্দ প্রকাশ করলেন।

'অঙ্ক ভালো পারেনি—নয়তো ফর্স্ট ই হ'তো।'

'তাহ'লে আপনাদের মনে হয় ও পারবে-টারবে?' নিবারণবাবুর লজ্জা করলো ছেলের বিষয়ে কিছু বলতে, কিন্তু না-ব'লেও পারলেন না।

'পারবে মানে ?'

'মানে—স্কুলে তো পড়েনি এর আগে—'

'সেই তো ভালো ছিলো। স্কুলে কেন দিলেন ?'

'সবাই বললো—' ('সবাই' মানে এখানে দিদিমা, তন্ময় বললো মনে-মনে)—'সবাই বললো স্কুলে না-দিলে ঠিকমতো পড়াশুনো হয় না, মিশুক হয় না—'

'বাজে সব !' শিবেনবাবু হাত নেড়ে উড়িয়ে দিলেন।

'তা পাশ-টাশ তো করতে হবে।'

'পাশ !' পাৎলা ঠোঁটে হাসলেন শিবেনবাবু। 'হ্যাঁ—এই পাশ করা ব্যাপারটা যে কত বাজে, অন্তত সেইটে জানার জন্য পাশ করা দরকার।'

'যত বাজেই হোক,' নিবারণবাবুকে বেশ চিন্তিত দেখালো, 'এ ছাড়া আর উপায় কী ?'

'সেই তো ! আমরা সবাই ভাবি উপায় নেই। কিন্তু আছে ! উপায় তৈরি হচ্ছে ! কাগজে পড়ছেন না গান্ধির খবর ?'

গান্ধির খবর নিবারণবাবু মন দিয়েই পড়েন, মনে-মনে ভালোও লাগে, তবু গান্ধির নামে আবার চমকালেন। গোলমাল না-বাধিয়ে ছাড়বে না লোকটা—মুশকিল ! আবার পুলিশের চাকরি—কুক্ষণে এই চাকরিতে ঢুকেছিলাম, কত শান্তির ছিলো স্কুলমাস্টারি ! এই শিবেনের মতোই তো

ছিলাম তখন, অমন ছটফটে না হোক, মনে-মনে কত আশা ছিলো, উৎসাহ ছিলো, 'সন্ধ্যা' না-পড়লে রাত্রে ঘুম হ'তো না। আর এখন—এরই মধ্যে—

'ভাবছেন কী?' ছাত্রের পিতার নীরব মুখের দিকে শিবেনবাবু এক পলক তাকালেন। 'দেখুন না দু-দিন—আগাগোড়া বদলে যাবে সব—সব নতুন হবে, সব নতুন হবে!' বলতে-বলতে হাতের মুঠি বন্ধ ক'রে ঝাঁকানি দিয়ে খুললেন—যেন কোনো ময়লা জিনিশ ছুঁড়ে ফেললেন রাস্তায়। তারপর বিদায়-টিদায় কিছু না-নিয়ে হঠাৎ ডান দিকের একটা নির্জন গলিতে বেঁকে গেলেন, দ্রুত হাঁটতে-হাঁটতে ভাঙা-ভাঙা গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন গাছপালা আকাশকে শুনিয়ে:

ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা!
ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ,
আধমরাদের ঘা দিয়ে তুই বাঁচা!—
রক্ত আলোর মদে মাতাল ভোরে
আজকে যে যা বলে বলুক তোরে,
সকল তর্ক···

আর শোনা গেলো না। হাওয়া উড়িয়ে নিলো কথা; ছায়া ঢেকে দিলো শাদা চাদরে জড়ানো মানুষটিকে।

★

সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরতে বিশ্রী। তার চেয়ে না-বেরোনো ভালো। যত আকাশ, যত আলো, যত হাওয়া, সব বাইরে; বাড়িতে টিমটিম লণ্ঠন, পিছনে মশা-ডাকা জঙ্গল, পাশে পচা পুকুর। একেবারে অন্ধকার হ'য়ে গিয়ে সব যখন ঢেকে যায়, তখন আবার অত খারাপ লাগে না, লণ্ঠনটাও জ্বলজ্বল করে বেশ, পরিষ্কার গুছোনো ঘরের ভিতরটাকে খুব চেনাশোনা কোনো মানুষের মতো লাগে। কিন্তু সন্ধেটা ঠিক হ'য়ে আসে যখন—। তা আর কী করা, সন্ধে না-হ'য়ে তো আর রাত হ'তে পারে না।

'ভ্যারেণ্ডা সাহেবের কুঠি নাকি ঝুপ্‌পুশ্‌?' বাড়িতে পা দিতে-না-দিতে কানে এলো দিদিমার গলা। 'মা গো মা, শুনে তো আমার পরান উড়ে গিয়েছিলো! তারপর ভোঁশলা এসে ব'লে গেলো—যাক, ভালোয়-ভালোয় ফিরতে যে পেরেছো আজ! হরি, হরি, হরি! তা ব্যাপারটা কী হয়েছিলো বলো তো?'

নিবারণবাবু তাঁর সাধ্যমতো বর্ণনা দিয়ে যাচ্ছেন, আর চোখ বুজে মালা জপছেন ব্রজসুন্দরী। চোখ বোজা থাকলেও কান তাঁর খোলা, একটু বেশিরকমই খোলা, একেবারে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্তটা তাঁর শোনা চাই। তন্ময় জানে যে কোর্টে ছাড়া বাবা যখনই যেখানে যাবেন, ফিরে এসে সবিস্তারে সব বলতে হবে দিদিমাকে;

আর মা যদি কখনো কোনো বাড়িতে সন্ধের পরে বেড়াতে যান, তাহ'লেও তা-ই ; এটাই এ-বাড়ির নিয়ম ; এর নড়চড় নেই। বাবা আবার চুপচাপ মানুষ, তার উপর দিদিমার সামনে চুরুট খান না—কী কষ্ট !

'কী বললে ? পুলিশ-সায়েবের কথা কী বললে যেন ?'

'না, কথা আর কী—এই তনুকে—'

'আধখানা কথা যদি পেটেই রাখবে বাপু, তাহ'লে আর কথা বলা কেন !' দিদিমা ঠোঁট উল্টিয়ে অর্ধেক চোখ খুললেন। 'তনুকে—কিছু বললো ?'

'একদিন যেতে বললেন বাড়িতে,' জেরার জবাব দিতে হ'লো।

'যেতে বললো ? কে ? সাহেব নিজে ?'

নিবারণবাবু একটু ভেবে বললেন, 'না—মেমসাহেব।'

'ও একই কথা !' একগাল হাসলেন দিদিমা, 'সাহেবও যা, মেমসাহেবও তা-ই। ভাগ্যি তোমার নিবারণ, ছেলের দৌলতে তবু সাহেবের নজরে পড়লে—নিজের মুরোদে তো কিছু হ'লো না ! তা যাও, কালই যাও, কালই একবার ঘুরে এসো ছেলেকে নিয়ে, আর সেই সঙ্গে নিসপেক্টর হবার দরবারটাও ক'রে এসো।'

উত্তরে নিবারণবাবু খুকখুক কাশলেন।

'তুইও তো যেতে পারিস, অনি—অনেকটা দূর,

তা ইমদাদুল্লার ঘোড়ার গাড়িটা নিলেই হবে! মেমসাহেবও এসে গেছে তোর বাড়িতে—একবার এমনিও তোকে যেতে হয়। তা ছেলেটা তোর যুগ্যি হয়েছে, অ্যাঁ! তনুটু!' দিদিমা এতক্ষণে তন্নুর দিকে তাকালেন, 'এত তো পড়িস, সাহেবের কাছে গিয়ে বেশ গটগট ইংরিজি বলতে পারবি তো?'

'আমি যাবোই না!' বাঁকা হাসলো তন্ময়।

'নাঃ, যাবো না!' নাতিকে মুখ ভ্যাঙচালেন দিদিমা—ঠিক যে রাগ ক'রে তা নয়, বরং আহ্লাদেই। 'অনি ওর ঐ ভেলভেটের স্যুটটা—'

'ভেলভেটের স্যুট!' অনসূয়া হেসে ফেললেন। 'সে তো দু-বছর আগেকার, মা—'

'তা হোক, ওটাই চেপে-চুপে পরিয়ে দিস, আঁটোসাঁটো ভালোই দেখাবে। আর শশী নাপিতকে ডাকিয়ে চুলটা—'

'আমি কক্খনো যাবো না!' তন্ময়ের মুখ দিয়ে পরিষ্কার বেরিয়ে এলো হঠাৎ।

'আচ্ছা, আচ্ছা,' নিবারণবাবু নড়বড়ে একটা চেষ্টা করলেন কথাটা চাপা দিতে। 'দেখা যাবে পরে।'

'দেখা যাবে!' ব্রজসুন্দরীর মালা-জপা হাত থেমে গেলো, দুই চোখ পুরোপুরি খুলে গিয়ে সন্ধ্যার ছায়ায় চিকচিকোলো। 'অ! ছেলেটাকে নিজের মতো ল্যাজ-গুটোনো শেয়াল বানাবে। এই তো?'

'আহা, মা—'

আর মা! ব্রজসুন্দরীর মুখ ছুটলো। জপের পিঁড়িতেই একটু ঘুরে ব'সে সুর দিয়ে-দিয়ে বলতে লাগলেন, 'কিন্তু একটা কথা শোনো, নিবারণচন্দ্র, আমার কথামতো চ'লে তোমার ভালো ছাড়া কি মন্দ হয়েছে কখনো? আমি জোর ক'রে তোমাকে পুলিশের চাকরিতে না-ঢোকালে আজ তুমি থাকতে কোথায়? সেই তিরিশ টঙ্কুলির মাস্টারিতেই ঘষতে তো? তা পুলিশের চাকরি তো আর ঘরে ব'সে গুজগুজ ক'রে হয় না—এ হ'লো জোয়ান জবরদস্ত পুরুষ-মানুষের কম্ম—ত্মাখো-না রেবতী রুদ্রকে, ছেলেকে চাবকে-চাবকে এমন হাত পাকিয়েছে যে চোর-ডাকাত নাম শুনলে মুর্ছো যায়। চাকরিতে লাফিয়ে-লাফিয়ে তাই উন্নতিও হচ্ছে! আর তুমি নিবারণচন্দ্র—তুমি যে-দারোগা সেই দারোগা! বেশ তো—হিম্মৎ নেই, কাজকম্ম পারো না, সায়েবদের খুশি-টুশি রাখো! যাও, আসো, ভেট পাঠাও—তবে না! আমার দাদাকে দেখেছি—খৃষ্টোমাসে সাবসুবোকে ভেট পাঠিয়েছে—সে এক-এক যজ্ঞির ভোগ! পুজো না-পেলে দেবতা কি আর খুশি থাকে হে? আমি তোমাকে বুদ্ধি দিতে পারি, কিন্তু তোমার চাকরিটা তো আর আমি ক'রে দিতে পারি না!'

নিবারণবাবু ঘাড় হেঁট ক'রে পুরো বক্তৃতাটা শুনলেন,

তারপর, 'যাই একবার দরজির কাছে, জামা তুটো'—খুব সাধারণভাবে এ-কথা ব'লে একটু-যেন দ্রুতই বেরিয়ে গেলেন, আর অনসূয়া ঘরে এলেন ধুনো দিতে। আগে যেমন অনেকবার হয়েছে, আবার তেমনি মা-বাবার উপর তন্ময়ের রাগ হ'লো—মা-র উপর তত না, যত বাবার উপর। মুখ বুজে সহ্য করেন সব! প্রতিদিন! প্রতিদিন! আর মা-ই বা কী! এমনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছেন যেন কিছুই হয়নি!—ঠিক, বাবার চাকরিটা দিদিমারই করা উচিত ছিলো, মানাতো তাঁকে, ভোঁশলার বাবার চেয়েও ভালো মানাতো: তিনিও সুখী হতেন, আমরাও বাঁচতাম। বাবার মতো ভালোমানুষ কেন-যে এই—দিদিমা বলামাত্র সেটাই করতে হবে?—যদি বাবা মাস্টারই থাকতেন, কি অন্য কিছু করতেন, তাহ'লেই তো—আচ্ছা মনে করো বাবা যদি চাকরি ছাড়েন, যদি তারা নোয়াখালি ছেড়ে কোথাও চ'লে যায়—অন্য-কোনো নদীর ধারে, ছোট্ট খড়ের ঘরে—এ-রকম রাক্ষসী নদী না, লক্ষ্মী নদী—কি সুইস-ফ্যামিলি রবিনসনের মতো কোনো-একটা দ্বীপে—গাছের ছায়া, ঘাসের গন্ধ, জলের শব্দ—কাউকে ভয় নেই, কারো সঙ্গে ঝগড়া নেই, কিছুর জন্যই ভাবনা নেই—আ—ঃ! খাওয়া? খাওয়ার আবার ভাবনা! নিজেরা খেত করবো, লাউমাচা, কুমড়োফুল, ঠাণ্ডা লালশাক, আর জলে তো মাছ আছে,

গাছে ফল—খেতে সবসুদ্ধ কতটুকুই লাগে বা? কিন্তু দ্বীপটা কোথায়?···বেশ, দ্বীপ যদি না-ই পাওয়া যায়, নদীর ধারে খড়ের ঘরটিও না জোটে তাহ'লে চলো না একদম কলকাতায়—সেই আশ্চর্য শহরে, যেখানে সব বই ছাপা হয় আর সব পত্রিকা বেরোয়; যেখানে হ্যারিসন রোড আছে, কর্নওয়ালিস স্ট্রিট আছে, আছে জলের কল, দমকল, ইলেকট্রিকের আলো; যত লোকের নাম ছাপার অক্ষরে বেরোয় তাঁরা সকলেই থাকেন যেখানে—স্বর্গের মতো সুন্দর সেই কলকাতাতেই চলো না! বাবা একটা দোকান-টোকান দেবেন, আমি স্কুল ছেড়ে দিয়ে দোকানে জিনিশ বেচবো; বেশি লোক তো আর কিনতে আসবে না, চুপচাপ দুপুরবেলা যে-বই ইচ্ছে পড়বো ব'সে-ব'সে—সব বই তো পাওয়া যায় কলকাতায়—ভিতরের দিকে একটা ঘরে থাকবেন মা, রান্না-টান্না করবেন, কোনো জিনিশ ফুরিয়ে গেলে ভাবনা কী—দোকানেই আছে সব! কী সুখ, কী সুখের জীবন! পৃথিবীতে সুখী হওয়া এত সোজা, অথচ মানুষ কিনা ভেবে মরে!

দোকানের কথাটা কী-রকম ক'রে বললে বাবা তক্ষুনি চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে তল্পিতল্পা বেঁধে কলকাতা রওনা হবেন, ভাবতে-ভাবতে তন্ময় ঘরে এলো। চকচকে মাজা লণ্ঠনটি কমানো আছে কোণে; ঘরে সন্ধ্যা, ধূপের

ধোঁয়া, আর সেই অন্ধকারে লাল পাড়ের শাড়ি-পরা মা। দরজায় দাঁড়িয়ে তন্ময় কয়েকবার ধূপের গন্ধে নিঃশ্বাস নিলো; ভিতরে পা দিয়েই ব'লে উঠলো, 'মা, আমার টেবিলটা—'

'হ্যাঁ, তোর টেবিলটা সরিয়েছি একটু,' মা ছেলের দিকে মুখ ফেরালেন। 'তোর শোবার জায়গাও ক'রে দিলাম এখানে।'

তখন তন্ময়ের চোখে পড়লো যে টেবিলটি স'রে গিয়ে দুই জানলার ফাঁকে ছোটো একটি তক্তাপোশের জায়গা ক'রে দিয়েছে। বিছানায় পরিষ্কার চাদর পাতা, ধবধবে একটি বালিশ, পায়ের কাছে ভাঁজ-করা কাঁথা, মাথার উপর চাঁদাকরা মশারি, আর মশারির উপর বাড়ির সবচেয়ে হালকা হাতপাখাটি।

মা তার কাছে এসে বললেন, 'কেমন? ঠিক হয়েছে?'

তন্ময় একবার মা-কে দেখলো, একবার তার নতুন বিছানা। কিছু বললো না।

'তোর দিদিমার খুব খারাপ লাগবে ক-দিন; ঐটুকু থেকে তো শুচ্ছেন তোকে নিয়ে।' মা একটু থেমে, আবার বললেন, 'তোর একটা আলাদা ঘর হ'লে বেশ হয়—না রে? তা...' কথা শেষ না-ক'রে নিচু হ'য়ে ধূপদানিতে হাওয়া দিলেন, সরু-সরু ধোঁয়া পেঁচিয়ে উঠলো তাঁকে

ঘিরে, ছিবড়ের আগুন লাল ছায়া ফেললো সিঁদুর-পরা কপালে, লাল পাড়টি জ্বলজ্বল করলো।

…কোথায় নদীর ধারে খড়ের ঘরে জলের ছল্‌ছল্‌ গান? আর, কত দূরে, কত স্বপ্নের পরপারে কলকাতা! ও-সব কি হবে কোনোদিন? যদি না-ও হয়, তবু এই টিনের ঘর, এই তার টেবিল, বই-খাতা, আর তার নিজের, তার একলার একটা বিছানা—এই বা মন্দ কী? মন্দ কী মানে?—আজ একটা দিনের মতো দিন, আজ সে প্রথম একা শোবে।

৩

ঝরঝর শব্দে তন্ময়ের ঘুম ভাঙলো। বৃষ্টি! বৃষ্টি পড়ছে তাদের টিনের চালে ঝমঝম, বাজনার মতো বৃষ্টি, চুপচাপ আকাশটা হঠাৎ যেন গলা ছেড়ে গান ধরলো। তন্ময়, বালিশে মুখ চেপে, ঠাণ্ডানরম কাঁথার ভাঁজে ঘন হ'লো। মনে পড়লো আজ রোববার, ঠিক দিনক্ষণ দেখে সকাল থেকে বৃষ্টি। এখনই উঠবে না, আর-একটু শুয়ে থাকবে, আর এই-তো প্রথম পুরো একটা বিছানা তার দখলে। অর্ধেক ঘুমে ডুবলো তন্ময়, অর্ধেক ভেসে থাকলো, শুনতে লাগলো ঝরঝর, ঝমঝম, রিমঝিম বৃষ্টি : কী ভালো, কী ভালো লাগে, এত ভালো-লাগা তার ছোটো শরীরে ধরবে কোথায়? কেমন ছুরছুর করছে বুক, গায়ে যেন কাঁটা দিচ্ছে—সে যেন অন্য-কেউ হ'য়ে গেছে এখন, তন্ময় নামে যে-ছেলেটা চ'লে-ফিরে বেড়ায়, তার চেয়ে অনেক ভালো, অনেক বড়ো, অনেক সুন্দর। সেই কথাই তো বৃষ্টি তার কানে-কানে বলছে ; কী বলছে?—

ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা,

…আধ-মরাদের ঘা দিয়ে তুই বাঁচা।

বাঃ! কোথায় পেলো? বানালো এইমাত্র?

ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা!—

বাঃ, এ তো শিবেনবাবু বলছিলেন কাল। আরো যেন খানিকটা ছিলো?

ওরে নবীন; ওরে আমার কাঁচা,

ওরে…

যাঃ, ভুলে গেছে। মনে নেই, তবু যেন মনে আছে, মন ভ'রে আছে কী-যেন। কী?

ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা—

এই কথাই বৃষ্টি বলছে বার-বার। তাকে বলছে। একলা তাকে। শিবেনবাবু বানিয়েছেন?

মা ডাকলেন, 'তনু, চা খাবি ওঠ।'

তন্ময় চোখ খুলে তাকালো। ঝাপসা, যেন ভালো ক'রে ভোর হয়নি। উঠে বারান্দায় এলো; ওখান থেকে যেটুকু পৃথিবী দেখতে পেলো, তার সমস্তটাই ঝাপসা। বৃষ্টি পড়ছে উঠোনে, রান্নাঘরের চালে, পিছনের ঝোপঝাড়ে, আরো দূরে শুপুরিগাছের মাথায়; পানাপুকুরের ফালিটুকুর শ্যাওলা রং চোখে পড়ে না, কেৎলিতে চায়ের জলের মতো উথলোচ্ছে। বারান্দাতেই বালতির জলে মুখচোখ ধুয়ে

নিয়ে তন্ময় চায়ে চুমুক দিলো—সুন্দর গন্ধ চায়ের—আর সেই সঙ্গে খেলো মুড়মুড়ে গরম চিঁড়েভাজা আর ছাঁচে-ফেলা নারকোলের সন্দেশ। সব দিনের চাইতে খেতে আজ বেশি ভালো লাগলো—আজ ছুটি, আজ বৃষ্টি, আজ সকাল থেকে ভালো-লাগায় পেয়েছে তাকে; কেবলই ভয় হচ্ছে এই বুঝি এটা চ'লে যায়, কিন্তু মিনিটের পর মিনিট বেড়েই চলেছে তার সুখ।

'ছ্যাখো কাণ্ড!' দিদিমা গজর-গজর করলেন—'জ্বালানি কাঠগুলি ভিজলো তো! আর এ-রকম হ'লে আমসত্ত্বই বা শুকোবে কেমন ক'রে? কী অনাছিষ্টি বাপু জষ্টি মাসে!'

জষ্টি মাসে বৃষ্টি
কী যে অনাসৃষ্টি!—

লাফিয়ে উঠলো তন্ময়ের মনে। হাসি পেলো তার: শিগগির তো এমন একটা দিন মনে পড়ে না, দিদিমা যেদিন একবার অন্তত না-বলেছেন, 'জ্বালিয়ে খেলো গরমে! এক ফোঁটা বৃষ্টিও কি হবে ছাই!'

চায়ে শেষ চুমুক দিয়ে সে উঠে এসে টেবিলে বসলো। কী করবে এখন? এই ছায়া-করা বৃষ্টি-পড়া ছুটির দিনটি কেমন ক'রে কাটাবে? সুখ যেন একটা ভার হ'য়ে আছে বুকের মধ্যে—এ-রকম মাঝে-মাঝে হয় তার, কিন্তু আজকের মতো কখনো যেন হয়নি—আর এ-রকম হ'লে,

দিদিমা যতই চ্যাঁচান, আর স্কুলের টাস্ক যতই বাকি থাক, কবিতা না-লিখে উপায় থাকে না। এই তো এখন···সেই অমিত্রাক্ষরের মহাকাব্যটা—তৃতীয় সর্গের আরম্ভটা এইরকম ভাবছে—

যখন ভীষণ দ্বন্দ্ব কৌরবে পাণ্ডবে
আরম্ভিল, দম্ভনাদে দুর্যোধন কহে,
'অর্জুন দুর্জয়, তার প্রচণ্ড গাণ্ডীব—'

কাল মনে-মনে আউড়িয়ে ভালো লেগেছিলো, আজ তো লাগছে না। আজ—আজ এ-সব থাক, আজ অন্য-কিছু। টেবিলে দাঁড়ানো বইগুলির উপর চোখ বুলিয়ে গেলো: টুকটুকে লাল শক্ত বাঁধানো মেঘনাদবধ, সবুজ রঙের কুরুক্ষেত্র, পলাশীর যুদ্ধ, ছোট্ট সদ্ভাবশতক, লালচে কাগজে হেমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী—সময় পেলেই কোনো-একটা খুলে বসে—কিন্তু আজ থাক, আজ এ-সব থাক। আজ আকাশ ভ'রে ছড়িয়েছে অন্য-এক সুর—'ওরে নবীন, ওরে আমার—' মনে পড়েছে, মনে পড়েছে!—

ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা,
ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ
আধমরাদের ঘা দিয়ে তুই বাঁচা!

এই তো! এ-রকম না-হ'লে আর হ'লো কী? এ-রকম না-লিখলে আর লেখা কেন? আজ তার ভিতরে এ-রকম

লেখাই ছটফট করছে—হ্যাঁ, এইরকম! খাতা খুলেই লিখতে আরম্ভ করলো :

সকালবেলা ঘুম ভেঙে যেই জাগা
কী যে ভালো—কী যে ভালো লাগা।
কী যে ভালো বৃষ্টি ঝমঝম,
কী যে ভালো মেঘের কালো রং।
কী যে ভালো ঠাণ্ডা ভিজে হাওয়া,
কী যে ভালো ঘরের মধ্যে ছায়া।
কী যে ভালো একলা ঘরের কোণে,
ইচ্ছেমতো লিখছি আপন মনে।

এত ভালোতেও ভালো-লাগা ফুরোয় না; একটু থেমে, লাইন ক-টি একবার প'ড়ে নিয়ে, আবার :

আজকে ছুটি—আজকে ছুটির দিন,
সারাটি দিন আজ আমি স্বাধীন।
ভাবনা তো নেই, নেইকো কোনো ভয়,
সকল দুঃখে করতে পারি জয়।

—সত্যি পারি না, কিন্তু এখন তো তা-ই মনে হচ্ছে। রোজ কেন হয় না?—

এমন যদি প্রতিটি দিন হ'তো,
ভুবন ভ'রে দুঃখ আছে যত
একসঙ্গে আসতো যদি সব,
করতো যদি ভীষণ কলরব,

তবু আমি করতাম না ভয়,

কোনো দুঃখ, দুঃখ তো আর নয়।

জোলো নীল কালিতে লাইনের পর লাইন বেরিয়ে এলো। বৃষ্টি পড়লো ঝরঝর, ঝমঝম, তারপর ঝিরঝির, তারপর টিপটিপ। কেমন একটা ঝোঁকের মধ্যে বেলা কেটে গেলো; একটি, দুটি, তিনটি কবিতা লেখা হ'লো। আরো পারে—কিন্তু মা স্নানের তাড়া দিয়ে গেছেন দু-বার। ক্লান্তও লাগছে—ক্লান্ত? এই অদ্ভুত অন্য রকম ভালো-লাগার নাম ক্লান্ত হওয়া?

'এমন যদি প্রতিটি দিন হ'তো'! কিন্তু তা হয় না। পরের দিনই খটখটে রোদ, সোমবার, ইশকুল, হাফ-ইআর্লির রেজাল্ট নিয়ে জটলা। টিফিনের সময় চিনেবাদাম চিবোতে-চিবোতে ফর্স্ট বয় পরিতোষ বললো, 'কী হে তন্ময়, তুমি নাকি ইংরেজিতে টেক্কা?'

'বেশ, বেশ!' পিছন থেকে এসে তন্ময়ের কাঁধে হাত রাখলো প্রফুল্ল, পরিতোষের দোসরা, মস্ত ঢ্যাঙা লিকলিকে প্রফুল্ল।

'All *but* he had fled—পার্জ করো তো but?' পরিতোষের প্রশ্ন।

'বলো তো কাকে বলে gerund ?'

'Verb-এর mood ক-রকমের ?'

'এমন একটা কথা বলো দেখি যা adjective হয়, আবার adverbও হয় ?'

পরিতোষ আর প্রফুল্ল যেন একটা খেলা পেলো তন্ময়কে নিয়ে। তন্ময় জবাব দিলো না, রেগেও গেলো না, শুধু বোকার মতো চোখ ক'রে তাকালো—ফূর্তি প্রায় মাটি! দুই প্রতিদ্বন্দ্বী বন্ধু নেতিয়ে পড়ছে, এমন সময় জিতু এলো হাঁপাতে-হাঁপাতে খবর নিয়ে, 'পরিতোষ, অঙ্কে তুই নব্বুই পেয়েছিস, আর প্রফুল্ল সাতাশি। অনাদিবাবু বললেন এইমাত্র।'

'আমি ভেবেছিলুম পঁচানব্বুই পাবো,' পরিতোষ একটু হাসলো। 'পাঁচ নম্বর কাটলো কিসে দেখতে হবে।'

'আমি আনসার-ই লিখেছিলুম নব্বুইয়ের,' প্রফুল্ল সকলকে জানালো। 'চৌবাচ্চার অঙ্কটা পরে কষবো ব'লে ভুলেই গেলাম শেষটায়।'

'তুমি—' পরিতোষ ফিরলো তন্ময়ের দিকে—'তুমি অঙ্কে কত পেয়েছো ?'

'জ্-জানি না।'

'যাও না, জেনে এসো না—ঐ তো অনাদিবাবু যাচ্ছেন,' প্রফুল্ল চোখ টিপলো। 'কী, গরজ নেই যে ?'

'আমি অঙ্ক পারি না।'

তন্ময় ভেবেছিলো তার মুখে এ-কথা শুনে ওরা খুশি হবে, কিন্তু খুশিটা বড্ড যেন বেশি হ'য়ে গেলো, হো-হো ক'রে হেসে উঠলো সবাই, এমন একটা হাসির কথা শিগগির যেন শোনেনি কেউ। শূন্যে দু-বার লাফ দিয়ে জিতু হঠাৎ ব'লে উঠলো, 'দেখি—আমার সঙ্গে গাধার কতটা তফাৎ—' তারপর মাটিতে ব্যাঙের মতো ব'সে প'ড়ে হাত দিয়ে জমি মাপতে-মাপতে তন্ময়ের পায়ের কাছে এসে বললো, 'সাড়ে-চার হাত!' হাসির হররা উঠলো আবার।

'বিশ্রী ইয়ার্কি সব!' টেড়ি-কাটা সুরথ প্রতিবাদ করলো। 'তুমি কিছু মনে কোরো না, তন্ময়—ওরা তো আর জানে না যে তুমি কবি।'

'অ্যাঁ! কবি! কবি! কপি!' উল্লাসের চীৎকার উঠলো।

'আঃ, চুপ! চুপ!' হাত তুলে সুরথ এগিয়ে এলো সামনে। 'পুলিশ-সাহেবের পর্যন্ত তাক লেগে গেছে কবিতা প'ড়ে, চা খাবার নেমন্তন্ন করেছেন বাড়িতে—জানো তোমরা?'

দিদিমা, নিশ্চয়ই দিদিমা!—হ্যাঁ, কালই তো তালতলায় বেড়াতে গিয়েছিলেন—উঃ, দিদিমার যন্ত্রণায় আত্মহত্যা করতে হবে একদিন!

'ইস্তক পুলিশ-সাহেব অবাক, অ্যাঁ!'

'আবার চা খাবার নেমন্তন্ন!'

'বলো না ভাই কেমন ক'রে কবিতা লেখো!'

'না, না, তার চেয়ে একটা কবিতাই বলো শুনি!'

'কবি, কবি, কপি!'

'ফুলকপি, না বাঁধাকপি!'

'ছেঁচকি না ঘণ্ট?'

'কচুপোড়া না কাঁচকলা?'

এই শেষ কথাটায় হাসির একটা বোমা ফাটলো। কেউ পেটে হাত দিয়ে ব'সে পড়লো, কেউ ঘাসের উপর লম্বা হ'লো, কেউ নাচতে লাগলো ধেই-ধেই ক'রে। হাসতে-হাসতে ছেলেগুলোর ম'রে যাবার দশা।

মনিটরের গাম্ভীর্য বজায় রেখে ইয়াসিন এতক্ষণ চুপ ক'রে ছিলো, এইবার বললো, 'হয়েছে! হয়েছে! থামো সব! এসো, তন্ময়।' বড়োসড়ো মুরুব্বিগোছের ইয়াসিন তন্ময়কে হাতে ধ'রে নিয়ে গেলো দূরে, রাস্তার ধারের বকুলগাছটার তলায়, পকেট থেকে দুটো ডাঁশা পেয়ারা বের ক'রে তাকিয়ে দেখলো একবার, তারপর বড়োটি এগিয়ে দিলো। সবুজ ফলটি হাতে নিলো তন্ময়, নিয়ে চুপ ক'রে থাকলো।

'খাও। খুব ভালো।' ইয়াসিন উপদেশের সঙ্গে উদাহরণও জুড়লো নিজের হাতেরটিতে দাঁত বসিয়ে।

পেয়ারা-টেয়ারা বেশি ভালোবাসে না তন্ময়, আর বাসলেও এটা নাকি খাবার সময়! আবার না-খেলে ইয়াসিন যদি রাগ করে? ইশকুলে পড়তে হ'লে যেমন কবিতা লিখতে নেই, তেমনি পেয়ারা না-খাওয়াটাও হয়তো বেয়াদবি? এই নিয়েই আবার হাসাহাসি—

'খাও না!'

তন্ময় আর দেরি করলো না। বড্ড চিবোতে হয় ব'লে ভালো লাগে না, কিন্তু গন্ধটা বেশ। ঘাসের মতো—ঘাসের বুনো ভাবটা বাদ দিয়ে। কত রকম গন্ধ আছে পৃথিবীতে? বৃষ্টির আগে হাওয়ার গন্ধ, বৃষ্টির পরে রোদের গন্ধ, আর এই যেখানে বকুল ঝ'রে লালচে প'ড়ে থাকে, এখানকার পচা-কড়া-মিষ্টি-মেটে গন্ধ।

'কেমন, ভালো না?'

'ভালো, খুব ভালো,' তন্ময় সায় দিলো, পৃথিবীর নানারকম গন্ধের কথা ভাবতে-ভাবতে। আর হঠাৎ সেই গন্ধময় পৃথিবীটাকে চুরমার ক'রে দিয়ে টিফিন-শেষের ঘণ্টা পড়লো ঢংঢং।

ক্লাশে ঢুকে দেখলো বোর্ডের গায়ে বড়ো-বড়ো অক্ষরে লেখা :

সাবধান! সাবধান! আছে এইখানে
তন্ময় নামেতে এক মস্ত বড়ো কপি!

স্মরথ দাঁড়িয়ে ছিলো বোর্ডের কাছে, তন্ময়কে দেখতে পেয়েই যেন খুব কাঁচুমাচু মুখে লেখাটা মুছে ফেললো। তাতে কী—ও-লাইন দুটি যে ক্লাশের অনেকেরই মুখস্ত, তন্ময় তা বুঝতে পারলো সেদিন স্কুল ছুটি হবার আগেই।

আমার দোষ কী? আমি কী করেছি, যার জন্য এই শাস্তি? ইংরিজিতে ফার্স্ট হয়েছি? হ'য়ে গেছি তো আমি কী করবো? আর কবিতা? হ্যাঁ, কবিতা লিখি ব'লে লজ্জাই করে, কিন্তু এটাও তো ইচ্ছে ক'রে করি না, ইচ্ছে করলেই না-লিখে যদি পারতাম, তবে না-হয়···এ-রকম হ'লে তো স্কুলে যাওয়াই মুশকিল!

তন্ময়ের এ-সব দুশ্চিন্তা কিছুদিনের মতো ঘুচিয়ে গ্রীষ্মের ছুটি এলো। নিশ্বাস ছেড়ে উঠোনের ছায়ায় মোড়া পেতে বসলো আশি দিনে পৃথিবীভ্রমণের আশ্চর্য গল্প পড়তে। কুটনো কুটতে-কুটতে বারান্দা থেকে দিদিমা হাঁক দিলেন: 'ওটা কী-বই রে?'

'গল্পের বই।'

'গল্পের বই? নভেল না তো?'

'হ্যাঁ, নভেল বলতে পারো।'

'এইটুকু বয়সে নভেল পড়িস তুই!' দিদিমার কুমড়ো-ধরা হাত বঁটির মুখে থেমে গেলো। 'বিষবৃক্ষ-টিশবৃক্ষ না তো?'

'না,' তন্ময় হেসে ফেললো। 'ইংরিজি নভেল।'

'অ্যাঁ!' গোল কুমড়োটা দু-টুকরো হ'য়ে ঢ'লে পড়লো দু-দিকে। 'ঐ সায়েবগুলোর কেচ্ছা পড়ছিস ব'সে-বসে! ওরা কি সাত জন্মে চান করে, না খাবার পরে মুখ ধোয়! ফেলে দে, ফেলে দে!'

দিদিমার কথা শুনে আর মুখভঙ্গি দেখে তন্ময় আওয়াজ ক'রে হেসে উঠলো।

'হাসি হচ্ছে আবার!' দিদিমার কটমট চোখ দেখে নাতির মুখ শুকিয়ে গেলো—'বাপের আদরে নষ্ট হচ্ছো, উঁ! নভেল পড়লে ছেলে কখনো মানুষ হয়! আমার বাবাকে দেখেছি, বঙ্কিমের বইগুলো সিন্ধুকে চাবি দিয়ে রেখেছেন, সাত হাত লম্বা-লম্বা ছেলেগুলো ছুঁতে পায়নি একদিন! সেইজন্যই না টাকার বস্তায় ব'সে এক-একজন পা দোলাচ্ছে আজ! ফ্যাল, ফ্যাল ও-সব বিতিকিচ্ছিরি বই! বই তো না, বিষ! বাঁকাচাঁদ ঠিক নামই দিয়েছিলো—বিষবৃক্ষ! বাবা রে বাবা, এ কি সোজা বিষ!' দিদিমা আধখানা কুমড়ো তুলে নিলেন, আর তন্ময় সেই ফাঁকে বইয়ের পাতায় চোখ নামালো।

'কী, ফেললি না?' বঁটি কাৎ ক'রে রেখে উঠে দাঁড়ালেন

দিদিমা। 'পরীক্ষায় অঙ্কে লাড্ডু খাবেন, এদিকে নভেল গিলবেন ব'সে-ব'সে! আরে শিক্ষা মানেই তো অঙ্ক—যত বিদ্বানই হও, হিশেব যদি না বোঝো, তবেই ঠকেছো! পঞ্চাশটা আঁক কষতে পারিস না রোজ—না-হয় তোর বাপ একটা ম্যাষ্টেরই রেখে দিক!'

পাছে দিদিমার রাগ তাকে ছেড়ে বাবাকে ধাওয়া করে, তন্ময় তাড়াতাড়ি ঘরে উঠে এলো, এসে সত্যিই অমন আশ্চর্য উপন্যাসটা রেখে দিয়ে অঙ্ক নিয়ে বসলো। ব্যাপারটা এমন-কী সাংঘাতিক যে সে পারবে না? চ্ছোঃ—মনে-মনে দিদিমাকে শুনিয়ে সে বললো—এই ছাখো না, তোমার অঙ্ককে ঢিট ক'রে দিচ্ছি দু-দিনে!

ছুটির প্রত্যেকটি দিন, লম্বা গরম চুপচাপ দুপুর ভ'রে ব'সে-ব'সে, বালি-কাগজের বড়ো-বড়ো পাতা পেনসিলের চিহ্ন দিয়ে সে ভ'রে ফেলতে লাগলো। খারাপ লাগছে, হাই উঠছে, গল্পের বইগুলি যেন চোখ টিপে কাছে ডাকছে। তক্ষুনি মাথা নামায় কাগজে, চোখ আর তোলেই না, পেনসিল চালাতে-চালাতে একেবারে বিকেল। এমনি ক'রে-ক'রে মন্দ কী, ভালোই তো, বেশ-তো মজা, আর যেই মজা লাগলো, অমনি আরো এগোলো, আর যত এগোলো ততই মজা লাগলো বেশি। আঙুলে ব্যথা হ'য়ে গেলেও ছাড়তে পারে না। হু-হু ক'রে শেষ হ'য়ে এলো

অ্যারিথমেটিক অ্যালজেব্রা—নিজেরই অবাক লাগলো—তাহ'লে সে অঙ্কও পারে—পারে ?

রোখ চেপে গেলো। নতুন মাসিকপত্র এলেও সে তক্ষুনি খোলে না, অঙ্ক আগে। সেদিন একদৌড়ে আটাশটা ইকোএশন ডিঙিয়ে মনেরমতো ক্লান্ত হ'য়ে লম্বা শুয়ে পড়েছে নতুন 'বোধিনী' হাতে নিয়ে। প্রথমে একবার সব পাতা উল্টিয়ে নেয়, তারপর বেছে-বেছে পড়ে—এই তার নিয়ম। কিন্তু সেদিনের সেই 'বোধিনী'র সব পাতা ওল্টানো হ'লো না, হঠাৎ এক জায়গায় চোখ থামলো, চোখ বড়ো হ'লো, নিশ্বাস পড়লো ঘন-ঘন—চিঁকতে না-পেরে শোওয়া থেকে বসলো, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে তক্তাপোশে লাফাতে লাগলো ধেই-ধেই। ছাপা—ছাপা হয়েছে—তার কবিতা, তার নাম, তার সেই বৃষ্টি-পড়া সকালের ভালো-লাগার কবিতা আধ পাতা ভ'রে ছাপা হয়েছে 'বোধিনী'তে, আর কবিতার তলায় তার নাম—'শ্রীতন্ময়কুমার সোম'! কবিতাটা-যে পাঠিয়েছে সে-কথাই তার মনে ছিলো না—সত্যি ছেপেছে, সত্যি ছেপেছে, সত্যি ছেপেছে !

মা ঘরে এসে অবাক। 'কী রে ? কী ?'

মা-র গলা পেয়েই সে থেমে গেলো। হঠাৎ একটা অসম্ভব লজ্জায় সমস্ত শরীর তার ভারি হ'লো—

বিছানায় উপুড় হ'য়ে প'ড়ে বালিশে মুখ চেপে কাঁপতে লাগলো।

আট-দশ দিন পর্যন্ত সেই কাঁপুনি লেগে থাকলো তার বুকে। স্কুল খুললো, ছেলেরা আবার একটু হাসাহাসির চেষ্টা করলো, কিন্তু সে এখন অন্য জগতের, কিছুই তাকে আর কষ্ট দিতে পারে না। যে-ক'টি মাসিকপত্রের নাম ঠিকানা সে জানে, সব ক'-টিতে তার বাছা-বাছা চোখা-চোখা লেখাগুলি পাঠাতে লাগলো—একটি দুটি ফেরৎ এলো প্রথমে—ফেরৎ কেন, ভুল করেনি তো?—তারপর আরো ফেরৎ—নিশ্চয়ই ওরা প'ড়েই ছাখে না, কি চেনাশোনা লোকের লেখাই ছাপে শুধু। যা ওরা ছাপে তার চাইতে তার লেখা কি মন্দ? না তো! অথচ ছাপলো না কেউ—কী অন্যায়! নতুন লিখে-লিখে আরো এক ঝাঁক পাঠালো, আরো চটপট ফেরৎ এলো—এমনকি তার লেখার গুণ 'বোধিনী'রও আর বোধগম্য হ'লো না।··· তবে কি তারই ভুল? যেমন চৈত্র মাসে এককোঁটা মেঘ দেখতে-দেখতে সারা আকাশ ছেয়ে ফেলে, তেমনি প্রশ্নটি প্রকাণ্ড কালো হ'য়ে ছড়িয়ে পড়লো তার মনে। আশা নিবলো, আলো ডুবলো। পাঁচখানা খাতা কবিতা লিখে সে ভ'রে ফেলেছে, তার মধ্যে মাত্র একটি নাকি ছাপা হবার যোগ্য! তার মানে, সে কিচ্ছু লিখতে পারে না—কী পারে?

কিছু পারে না: খেলার মাঠে ছুটোছুটি পারে না, চটপট কথা বলতে পারে না, হাসিঠাট্টা হৈ-হৈ পারে না, এমনকি স্কুলের পড়াতেই বা এমন-কী! তার হতাশা মনে হ'লো আকাশের সমান, তার দুঃখ মনে হ'লো সমুদ্রের মতো। কী করতে আছে সে, কেন সে ম'রে যায় না, কী হবে তাকে দিয়ে পৃথিবীতে?

৪

ক-দিন ধ'রে আকাশও ভারি হ'য়ে আছে তার মনের মতো, মরা দিন, মন-মরা, বৃষ্টি টিপিটিপি, বৃষ্টি বাঁকা-বাঁকা, তার ব্যর্থতার মতো মস্ত কালো রাত, আর রাতের বুক ভ'রে তার আশার কান্নার মতো হাওয়া। আর সেদিন সন্ধে থেকেই বাবা ঘন-ঘন আকাশের দিকে তাকাচ্ছেন, মাঝে-মাঝে নিশ্বাস ফেলছেন, পাইচারি করছেন বারান্দায়; মুখ আকাশে, কপাল কুঁচকোনো, চুরুট নিবে-যাওয়া। রাত্রে খেতে ব'সে খেতেই পারলেন না ভালো ক'রে।

মা জিগেস করলেন: 'হয়েছে কী?'

'না—কিছু না,' ব'লে পিঁড়িতে ব'সেই আকাশের চেহারাটা একবার দেখে নেবার চেষ্টা করলেন।

মা মনের ভাব বুঝে বললেন, 'বর্ষাকালে মেঘ করবে, তাতে আবার ভাবনা কী।'

'না—ভাবটা যেন ভালো না—সাইক্লোন-মতো—'

'হ্যাঃ! যত তোমার—!' অনসূয়া হাসলেন। 'এই যে—মাছের মুড়োটা—'

'না—না—পারবো না!' ব্যাকুলভাবে বাধা দিলেন নিবারণবাবু। 'তা সাবধানমতো থেকো-টেকো—যদি কিছু হয়—কালেক্টরিতে সিগন্যালও এসে গেছে—' শেষের কথাটা বলতে তাঁর গলা যেন বুজে এলো।

'তোমার মতো সাপ-ঝলকি মানুষ আর দেখিনি বাপু!' মোড়ায় সমাসীন ব্রজসুন্দরী গলা ছাড়লেন। 'কোথাও টুং ক'রে একটু আওয়াজ হ'লেই তোমার যদি আর গলা দিয়ে ভাত না নামে, তবে আর পুরুষ হ'য়ে জন্মেছিলে কেন বলো তো?' চিবিয়ে-চিবিয়ে, মালা-জপা আঙুল না-থামিয়ে, আয়েস ক'রে বললেন কথাগুলি; যাকে বললেন তার মাথা কতটা হেঁট হ'লো তা আধখানা চোখে লক্ষ্য ক'রে খুশি গলায় আবার সুর ধরলেন: 'ছাইক্লোন! ছাইক্লোনের আবার সাবধান কী! সক্কলেরই যদি সব্বোনাশ হয় তাহ'লে তুমি, নিবারণচন্দ্র, তুমি একলা কি আর সাবধান হ'য়ে বাঁচবে!'

কথা শুনে নিবারণবাবুর বুক কাঁপলো; আর-কিছু ভেবে না-পেয়ে খানিকটা পাতে-ফেলা শুকনো ভাতই তাড়াতাড়ি মুখে দিয়ে ফেললেন, আর সেই সুযোগে ছোটো রুইয়ের মুড়োটি আলগোছে পাতে ফেলে অনসূয়া বললেন, 'রাখো তো, মা, তোমার অলক্ষুনে কথা!'

'আরে অত ধুকধুক করলে সবই পেয়ে বসে! সেই বিয়েনব্বুই সালের ঝড় দেখেছি তো আমরা।—বাপরে, কী উথাল-পাথাল! এক্কেবারে প্রলয়!—তাও কি ছিষ্টি সেদিন শেষ হ'য়ে গিয়েছিলো? আবার না-হয় হবে ও-রকম—ভয় কী!' ব্রজসুন্দরী আরো একটু জাঁকিয়ে বসলেন মোড়ায়, যেন ঝড়-টড় হ'লে তিনিই পিঠ দিয়ে ঠেকিয়ে দেবেন—আর প্রকাণ্ড দিদিমার দিকে তাকিয়ে কথাটা প্রায় বিশ্বাস হ'লো তন্ময়ের।

খাওয়ার পরে সে বাবাকে জিগেস করলো: 'সাইক্লোন বুঝি ভীষণ?'

'যেখান দিয়ে যায় কিছু আর রাখে না!' নিবারণবাবু ফিশফিশ গলায় বললেন, যেন খবরটা খুব গোপনীয়।

'রাখে না মানে?'

'বাড়িঘর, গাছপালা, টেলিগ্রাফের থাম—'

'স্-সব উড়িয়ে নিয়ে যায়?'

নিবারণবাবু তাকিয়ে দেখলেন, ছেলের চোখ চকচকে। চুরুট ধরাতে দুটো-তিনটে দেশলাই-কাঠি পুড়ে গেলো।

'এখানে হবে সাইক্লোন?' তন্ময়ের প্রশ্ন।

ছেলের চোখের চকচকানি বাপের ভালো লাগলো না; অন্য দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কী জানি!' ব'লে হতাশমতো নিশ্বাস ছাড়লেন।

আহা—সত্যি হয় যদি!—ঘুমের আগে শুয়ে-শুয়ে তন্ময় ভাবলো!—এই টিনের ঘর, বাঁশবন, পচা পুকুর, মশা-ডাকা সন্ধ্যা—সমস্ত যদি এক ফুঁয়ে উড়িয়ে নিয়ে যায়, কিছু আর না থাকে! কিছু না—দিদিমা না, ইশকুল না, ইশকুলের ছেলেরা না, সে-যে কিছু পারে না সেই দুঃখ না, বাবা-যে এত ভিতু সেই লজ্জা না; সব বোকা-বোবা-বিশ্রী যদি এক মিনিটে নেই হ'য়ে যায়! ওঃ, তাহ'লে সে বাঁচে, বাঁচে;—কিন্তু তাকে বাঁচাবার জন্য ঈশ্বর কি আস্ত একটা সাইক্লোন লেলিয়ে দেবেন নোয়াখালির উপর? পর-পর ফেরৎ এসে-এসে তার নিজের লেখা কবিতা তাকে বিশ্বাস করিয়েছিলো যে তার দিকে তাকাবার ঈশ্বরের তেমন ফুরশৎ নেই। তাই বাবার অমন আকাশজোড়া দুশ্চিন্তা সত্ত্বেও বেশি কিছু আশা না-ক'রেই সে ঘুমোলো।

সকালে উঠেই মেঘভাঙা রোদ চোখে পড়লো। অন্য যে-কোনো দিনের মতোই আর-একটা দিন, তাহ'লে! আবার সেই মরা, ছেঁড়া সারি-সারি বিচ্ছিরি দিন, আর বেঁটে, বোকা, তোৎলা সেই ছেলেটা, যাকে 'আমি' না-ব'লে তার উপায় নেই! সেই সব!…কিন্তু ইশকুলের সময় হ'তে-হ'তেই আবার মেঘ, বাঁকা হাওয়া, বৃষ্টিও বাঁকা;—ট্যারচা হ'য়ে পড়ছে, এক-এক ফোঁটা বৃষ্টি যেন সার্কল-এর এক-একটা টুকরো, নামতে-নামতে ক্ষুর

মতো প্যাঁচ খাচ্ছে। তন্ময় স্কুলে গেলো, কিন্তু স্কুল তাড়াতাড়ি ছুটি হ'লো, বাবাও শিগগির বাড়ি ফিরলেন— সকাল থেকে নাকি লাল সিগন্যাল দিচ্ছে চট্টগ্রামে: সাইক্লোন উঠেছে, সাইক্লোন আসছে। 'খাওয়া-দাওয়া সেরে নাও চটপট—' এর বেশি বাবা কিছু বলতে পারলেন না; কেবল ঘর আর বারান্দা করতে লাগলেন, কেবল আকাশের দিকে তাকাতে লাগলেন।

সন্ধে হ'লো, অন্ধকার নামলো। দিনের বেলা আকাশের রংটা ছিলো শিষের মতো, এখন একটু-একটু সবুজ দেখাচ্ছে, মাঝে-মাঝে লালচে, চাপা রাগের চেহারা। কিন্তু তন্ময় জানে ও-সব ফাঁকি; কখনো যা ঘটেনি আজও তা ঘটবে না; কখনো যা ঘটেনি এখনই তা ঘটতে পারে গল্পে, শুধু বানানো গল্পে;—আর তাই সে লণ্ঠনের সামনে বই খুলে বসলো, চ'লে গেলো জুল ভার্নের সঙ্গে ভলক্যানোর তলায়, পৃথিবীর জল-ভরা গরম বুকের মধ্যে।

'তন্নু!···তন্নু!'

বাবার গলা যেন আর-কারো মতো। তন্ময় চোখ তুলে তাকিয়ে বাবার মুখটাও অন্য রকম দেখলো।

'শিগগির!'

'ক্‌-কী? কী হয়েছে?'

'আসছে!'

'সত্যি সাইক্লোন!' তন্ময় লাফিয়ে উঠলো।

'বান! নদীর বা-আ-ন!'

পিছন থেকে মা বললেন, 'সত্যি নাকি?'

'শুনছো না রাস্তায়?' ব'লে বাবা বিছানায় ব'সে পড়লেন, তখনই উঠে বাইরে ছুটলেন।

তন্ময়ও ছুটলো। উঠোন পেরিয়ে রাস্তায় এসে বাবার পিছনে দাঁড়ালো। অন্ধকারে আবছা মনে হ'লো অনেক লোক, তাড়াতাড়ি কথা বলতে-বলতে তাড়াতাড়ি ছুটছে তারা, আর কী-রকম একটা গোলমাল চারদিক থেকে উড়ে আসছে। 'বান! বান আহে!' একবার সে স্পষ্ট শুনতে পেলো, আর তারপরেই একজন লোক ছুটে যেতে-যেতে ব'লে গেলো, 'ঘরে যান কত্তা, পানি উতলাইছে।'

তন্ময় ডাকলো, 'বাবা!'

'তুই!—' নিবারণবাবু এতক্ষণ দেখতে পাননি ছেলেকে—'তুই কেন এসেছিস?' ব'লেই তার হাত চেপে ধরলেন, আর তাইতে তন্ময় বুঝলো বাবা কী-রকম কাঁপছেন। বাড়ির দিকে ফিরেই থামলেন তিনি: রেবতীবাবুর বাড়ি থেকে মস্ত দল বেরিয়ে আসছে; লণ্ঠন হাতে প্রকাণ্ড ভোঁশলা, বাক্স-বগলে প্রকাণ্ড রেবতীবাবু, বাচ্চা কোলে ভোঁশলার মা, আর পাশে-পাশে ভোঁশলার চার-চারটি পায়ে-হাঁটা ভাই-বোন।

'নিবারণবাবু !'

'কী—কী—খবর কী ?'

'আর খবর ! এসে গেছে শান্তাসীতা পর্যন্ত—আজ আর রক্ষে নেই।'

'অ্যাঁ !'

'কোনো-একটা দোতলায় উঠুন গিয়ে সকলকে নিয়ে—আমরা যাচ্ছি রামকৃষ্ণ মিশনে—হে কৃষ্ণ, তোমার মনে এই ছিলো !'

তন্ময় অবাক হ'লো। অত বড়ো প্রকাণ্ড জোয়ান রেবতীবাবু, বাঘা ডাকাত যাঁর নামে মূর্ছা যায়, আর ভোঁশলা যাঁর হাতে চাবুক খেয়ে ডাক ছাড়ে—সেই রেবতীবাবুও তার বাবার মতোই ভিতু ?···আর হাতে ঐ বাক্সটা কিসের ?

ভাববার সময় পেলো না, এক হ্যাঁচকা টানে বাবা তাকে নিয়ে এলেন ঘরে। আর তারপর কী কাণ্ড ! মা কথা বলছেন, বাবাও চেষ্টা করছেন কিছু বলতে ; কিন্তু, যথারীতি, দিদিমার গলাই শুধু শোনা যাচ্ছে। রামকৃষ্ণ মিশনেই যাবে, না কি সরকারি ট্রেজারিতেই উঠবে গিয়ে, এ নিয়ে বিতণ্ডা হ'লো একটু : রামকৃষ্ণ মিশনটা কাছেও, আশ্রয়ও ভালো, কিন্তু সেইজন্যই পাড়ার সবাই যাবে ওখানে, গিশগিশ করবে একেবারে ; যদি সমস্ত রাত

থাকতে হয়, যদি ছু, তিন, চার দিন থাকতে হয়, তাহ'লে ঠেলাঠেলিতেই মরবে মানুষ। 'তাই,' দিদিমা বললেন, 'তেরোজুরিতেই যাওয়া ভালো, ওখানে তো হাকিম দারোগা ছাড়া যে-সে যেতে পারবে না, আর বাড়িটাও অনেক উঁচু, ছুটো রামকৃষ্ণ মিশন ডুবে গেলেও সে দাঁড়িয়ে থাকবে ঠিক ; তাছাড়া আজকাল তো আর ধম্মকম্মের জোর নেই, গবর্মেণ্টোই সব, গবর্মেণ্টোর প্রতাপে বানের জলও সেলাম ঠোকে!' যুক্তিতে জিতে দিদিমা দম নিলেন, তারপর একটু নিচু গলায় বললেন, 'অনি, তোর গয়নার বাক্স, আর বাড়িতে টাকা-পয়সা যা আছে সব গুছিয়ে নে এবার। হরি! হরি!' আর তখন তন্ময় বুঝলো রেবতীবাবুর হাতের বাক্সটা কিসের।

শুধু গয়নার বাক্সই না, ভাঁজ-করা শতরঞ্চি, এণ্ডির চাদর, একটা বালিশও—বাবা লণ্ঠন হাতে নিলেন, এবার বেরোলেই হয়—কিন্তু ঠিক তখনই, ঠিক দরজার ধারে ছড়িয়ে, দিদিমা ব'সে গেলেন পান সাজতে।

আরো-বড়ো ভয়ে প্রতিদিনের ছোটো-ছোটো ভয় বোধহয় ভেঙে গিয়েছিলো বাবার, হঠাৎ আশ্চর্যরকম রেগে উঠে বললেন, 'আবার কী? পানের জন্য প্রাণ দেবেন নাকি?'

'রোসো বাপু—শেষটায় পান না-খেয়ে পেট ফেঁপে মরি আরকি!' ডিবে ভরতি ক'রে দিদিমা উঠে দাঁড়ালেন।

'আজ দেখছি মরতেই হবে! ঐ তো জলের শব্দ! হায় হায়!'

তন্ময় কান পাতলো। যেন স্পষ্ট শুনলো শোঁ-শোঁ শব্দ; জল, হাওয়া আর আকাশ ছুটে আসছে তার দিকে; সেই হাওয়া যার বাধা নেই; সেই আকাশ, এখানে ব্যর্থ হ'য়ে সব আশা যেখানে বাসা নিয়েছে। বন্য আনন্দে তার বুক ভ'রে গেলো; যে-বন্যা এখনো এসে পৌঁছয়নি, সেই বন্যা তার বুকে নামলো সকলের আগে। আবার কান পেতে শুনলো; এবার যেন আরো স্পষ্ট: সত্যি! এতদিনে সত্যি হ'লো তাহ'লে!

রাস্তায় এসে ভালো ক'রে চারদিকে তাকালো। এমন একটা রাত!—কিন্তু দেখতে-শুনতে অন্য সব রাতের মতোই। বৃষ্টি নেই, শুধু হাওয়া, তেমনি প্যাঁচালো, কিন্তু জোর নয় তেমন; আকাশে মেঘের ফাঁকে-ফাঁকে একটি-দুটি তারাও উঁকি দিচ্ছে। চৌরাস্তায় এসে মনে হ'লো, নোয়াখালির সমস্ত লোকই বেরিয়ে পড়েছে; দলে-দলে ছুটেছে কেউ এদিকে, কেউ ওদিকে; কেউ মরবে না, সকলেই বাঁচবে, শহরের কয়েকটি মাত্র পাকা বাড়ির কোনো-একটিতে যে-কোনোরকমে মাথা গুঁজে বাঁচবে; মেয়েরা জবুথবু, বাচ্চারা ঢুলুঢুলু, আর পুরুষরা চেঁচিয়ে এ ওকে ডাকছে;— কত লণ্ঠন রাস্তা ভ'রে, কত কাঁপা-কাঁপা লাল চোখ

অন্ধকারকে ফুটো ক'রে দিচ্ছে। শহর ভ'রে মস্ত একটা ফুর্তি ছাড়া পেয়েছে হঠাৎ—তন্ময়ের তা-ই মনে হ'লো—যেন সবাই মিলে পিকনিকে মেতেছে আজ রাত্রে, এই মরা, ফাঁকা সন্ধের পরেই নিঃঝুম রাস্তাগুলি প্রাণ পেয়েছে মানুষের পায়ের শব্দে, গলার আওয়াজে; হাসির শুড়শুড়ি ছড়িয়ে দিচ্ছে হাওয়া। পা চলছে তাড়াতাড়ি, আরো তাড়াতাড়ি: দিদিমারই কষ্ট সবচেয়ে, মোটা মানুষ, তার উপর গয়নার বাক্সটি আর-কারো হাতে দেবেন না; দেখতে-দেখতে কাচারির মাঠ এলো, সবুজ জোনাকিতে জ্বলজ্বলে বটতলা—আরো খানিকটা গিয়ে মাঠের মধ্যে সরু পথে নামলো তারা, তারপর শুড়কির রাস্তা; তন্ময়ের বেশ ভালো লাগছিলো চলতে, কিন্তু এসেই পড়লো। ট্রেজারির দোতলাটাকে আরো যেন ধুমশো দেখাচ্ছে অন্ধকারে—কত ঘর, চওড়া বারান্দা, লোহার গরাদ, গুর্খা সেপাই—কেন? কী? কী হয় ওখানে?

'হুকুমদা—র!' হিংস্র হাঁক উঠলো হঠাৎ।

বাবা কী-একটা জবাব দিলেন; বন্দুক ঘাড়ে সেপাই টহল শুরু করলো আবার। কতক্ষণ ঘুরবে ও-রকম? সারা রাত?

সিঁড়ি দিয়ে উঠতেই ভোঁতা, ভারি একটা গন্ধ তন্ময়কে যেন মাথায় বাড়ি দিলো। তার চেনা গন্ধ: ধুলো,

ময়লা-ময়লা হলদে কাগজ আর বাবার চুরুটের ধোঁয়ায় মেশানো। এর মানেই খাকি পোশাক, লোহার গরাদ, বুটের খটখট, চ্যাঁচামেচি, ছুটোছুটি, হায়-হায়, হৈ-হৈ—কী-দরকার এ-সবের!

দোতলার একটি ঘরে বাবা তাদের নিয়ে এলেন। মস্ত ঘর, কড়িকাঠ থেকে ল্যাম্পো ঝুলছে, শক্ত ইঁটের চুনকাম-করা প্রকাণ্ড দেয়াল যেন দিদিমার মতো—কি দিদিমার গবর্মেণ্টোর মতোই জবরদস্ত।

আরো ক-বাড়ির লোক আশ্রয় নিয়েছে সেখানে। সবাই বুদ্ধি ক'রে কিছু বিছানা এনেছে; লম্বা ক'রে পেতে বাচ্চাদের শুইয়ে দিয়েছে, আর নিজেরা ভুরু কুঁচকে বাইরে তাকাচ্ছে আর গুনগুন কথা বলছে মাঝে-মাঝে। বাবাকে দেখে একজন বললেন, 'এই যে!'

'পেশকারবাবু! কতক্ষণ?' বাবার গলায় এতক্ষণে প্রাণ এলো।

'আমরা-তো সেই সন্ধে থেকে ব'সে আছি। কী কাণ্ড! অ্যাঁ!'

'মেহেরপুরে বদলির অর্ডর এসে গেছে আমার!' বললেন আর-একজন। 'আর দুটো দিন আগে এলেই হ'তো!

[illegible] পরেই চুপ। অল্প আলোয় বুড়ো-বুড়ো ছায়া [illegible] দেয়ালে। যেন লাকশাম জংশনের ওএটিংরুমে

আছি: সবাই এক গাড়ি ধরবো, কিন্তু সে-গাড়ি কোথায় নিয়ে যাবে কেউ জানি না।

বড়ো দেরি হচ্ছে গাড়ির। তন্ময় এ-জানলা ও-জানলায় ঝুঁকে-ঝুঁকে দেখতে লাগলো। দু-তিনবার ও-রকম করার পর দিদিমা তাকে ডাকলেন অত্যন্ত আদরের কিন্তু অত্যন্ত গোপনীয় নামটি ধ'রে: 'এই গোবরা!' উপস্থিত ভদ্রলোকদের সম্মান দেখিয়ে নিচু গলাতেই ডাকলেন, কিন্তু অনেক্ষণ চুপচাপের পরে তা-ই বেশ চড়া শোনালো।

'অমন লাফিয়ে-লাফিয়ে বেড়াচ্ছিস কেন রে? তামাশা দেখতে এসেছিস? চুপ ক'রে বোস!'

শতরঞ্চির কোণ ঘেঁষে তন্ময় ব'সে পড়লো। ভাবনা কী—আর বেশিক্ষণ তো না, আসছে, এলো ব'লে, এই তেরোজুরির গলা পর্যন্ত ফুলে উঠবে, সকলের আগে ডুবিয়ে মারবে দিদিমাকে।

কিন্তু আসে না কেন?

আবার কথাবার্তা শুরু হ'লো। দিদিমা বাবাকে একটা পান দিলেন, আর দিদিমার ডিবে থেকে বাবা পান দিলেন অন্য দুই ভদ্রলোককে। পান চিবোতে-চিবোতে পেশকারবাবু দৌলতখাঁর গল্প পাড়লেন, অমন বন্যা আর হয়নি, নারকোল গাছের মাথায় সাপে-মানুষে জড়াজড়ি ক'রে সাত দিন সাত রাত কাটিয়েছে। বদলি-হ'য়ে-যাওয়া ভদ্রলোক জিগেস করলেন, 'সাপে কাটেনি কাউকে?'

'সেই-তো মজা!'

এর পর সাপের গল্প উঠলো; সাপের কামড়ে মারা পড়লো ছ-মাসের মধ্যে হাতিয়া থানার দু-দুজন ইন্সপেক্টর, আর সন্দ্বীপে একবার কালোকেলো একটা দশবছরের ছেলেকে সারাদিন জড়িয়ে রেখে সন্ধেবেলা নিজেই চ'লে গিয়েছিলো বিরাট কালকেউটে—ছেলেটাকে কেষ্টঠাকুর ব'লে পুজো করতে আসছিলো দলে-দলে সবাই, কিন্তু বাঁচলো না। খানিক পরে সাপের গল্পও শেষ হ'লো, দু-একবার হাই উঠলো, ওদিকে বাচ্চারা মাছ-পাতুরি ঘুমুচ্ছে।

এখনো আসে না?

দূরে, কাছে, আবার দূরে কুকুরের ডাক উঠলো। আর আরো, আরো দূরে শেয়ালের কোরাস সাড়া দিলো পর-পর। তারপর চুপ, সব চুপ; যেন দুপুর-রাত।

'মশা!' পেশকারবাবু হাঁটু চাপড়ালেন। আর-একজন বললেন, 'ব্যাপার কী? সাড়াশব্দ যে নেই কিছু?'

এতক্ষণে খেয়ে-দেয়ে বাড়ির বিছানায় না-ঘুমিয়ে কেন সবাই ছেলেপুলেসুদ্ধ এখানে এসে মশার কামড় খাচ্ছে, অনেকক্ষণ পর তা যেন নতুন ক'রে মনে পড়লো সকলের। নোয়াখালি ভাসিয়ে দিতে যে-বন্যা রওনা হয়েছে, তার বিষয়ে যত কথা জানা গেছে, শোনা গেছে, ভাবা গেছে, সব আবার নতুন ক'রে বলা হ'লো, তারপর আবার চুপ।

আরো খানিকক্ষণ কাটলো। তারপর রাস্তায় শব্দ শোনা গেলো, পায়ের শব্দ, গলার আওয়াজ, এমনকি—হাসি। বদলি-হ'য়ে-যাওয়া ভদ্রলোক লাফিয়ে উঠে জানলার ধারে গেলেন, একটু পরেই চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ফিরে যাচ্ছে! লোক সব ফিরে যাচ্ছে। কিছু না! কিছু না!'

'কিছু না?'

'কিছু না।'

কিছু না?...কিছু না?...তন্ময়ের বুকের মধ্যে যেন দপ ক'রে আলো নিবে গেলো। সত্যি কিছু না?...না, কিছুই না, ঐ কিছু-নাটাই সত্যি।

কিছু-নাটাই সত্যি। সেই রাস্তা; সেই দলে-দলে লোক, হাসছে, কথা বলছে চেঁচিয়ে; কে এই গুজব রটালো, শহরসুদ্ধ লোককে বোকা বানালো কে; চোরের দল না তো?—এখন ফিরে গিয়ে সব ঠিকঠাক পেলেই হয়—আমরাও যেমন—একেবারে সাত-তাড়াতাড়ি—বোকামি আর কাকে বলে! বলছে, কিন্তু ঐ বোকামিতেই সবাই খুশি, মাত্র একটুখানি বোকা ব'নেই শেষ পর্যন্ত যে রেহাই পেলো, তাতেই খুশি।...তাহ'লে সবচেয়ে বড়ো কথা হ'লো বেঁচে থাকা! যেখানে হোক, যেমন ক'রে হোক, ইঁদুরের মতো গর্তে হোক, জোঁকের মতো পানাপুকুরে হোক, বাঁচতে হবে, বেঁচে থাকতে হবেই। কিছু হয় না, এই নোয়াখালিতে

কিছু হয় না ; ফার্ডিনাণ্ড সাহেবের বাড়ি ধ্বংসে পড়ে, কিন্তু কিছু হয় না ; সাইক্লোন শাসায়, বান শানায়, কিন্তু কিছু হয় না ; এখানে মানুষ শুধু বাঁচে, বেঁচে থাকে, দিনের পর দিন শুধু বেঁচে থাকে।

৫

কিন্তু অন্য দেশ আছে, অন্য দিন, অন্য দিন-রাত্রি।

বেলা-দশটার বাড়ন্ত রোদ্দুরে নারানগঞ্জ কাছে এলো। ফুরফুরে নৌকো, ছিপছিপে লঞ্চ, চকচকে চঞ্চল মাছের মতো মোটর-বোট, আর মাঝে-মাঝে মস্ত কালো অনড় বোকা হাঁ-ক'রে-থাকা চুপচাপ এক-একটা ফ্ল্যাট—ফ্ল্যাট বলে কেন?—ঐ-তো কচ্ছপের মতো ছিরি, কিন্তু নামের কী বাহার! কেউ রাজপুতনা, কেউ অ্যাবারডীন, কেউ আবার গণেশ!—তা গণেশটা তবু মানিয়েছে।—রইলো সব দু-পাশে, পড়লো পিছনে; তারপর নদী সরু, শহর শুরু, আস্তে হ'লো চলা, ধারে-ধারে বাড়ি, বাগানওলা—আঃ, কী-সুন্দর ঐটে, সিঁড়ি নেমেছে নদী পর্যন্ত—কে থাকে?

'পাটের সাহেবদের বাড়ি ও-সব।' বাবার এই উত্তর শুনে তন্ময় বুঝলো যে মনের কথাটা সে মুখেও বলেছিলো।

সেই ফার্ডিনাণ্ড-সাহেবের বাড়ি! যেখানে যত সুন্দর বাড়ি, বাগান-সাজানো, আলো-খোলা, জলছোঁয়া-সিঁড়িওলা—

সব সাহেবদের ?—'স্-সাহেবদের কেন ?' জিগেস না-ক'রে পারলো না।

'ভগমানের দয়া হ'লে সবই হয় রে,' তক্ষুনি জবাব দিলেন দিদিমা। 'নরু-বীরুকে তা-ই তো আমি বলেছিলুম সেবার—ধনদৌলত পেয়ে তাঁকে কিন্তু ভুলো না যিনি সব দিচ্ছেন। তাঁকে যদি মনে রাখো, তবে আরো হবে।—আর হ'লোও তা-ই। এই পেটো ফিরিঙ্গির বাংলো দেখেই হকচকাচ্ছিস, তনু—দেখবি তোর নরুদার বাড়ি—সে নাকি রাজপ্রাসাদ!—মামলা জিতিয়ে পান্নাপুরের রাজার লাখ টাকা আয় বাড়িয়ে দিলো নরু—তাই ঢাকার পান্না-হাউসটাই রাজা ছেড়ে দিয়েছেন তাকে।' শেষের খবরটা ব্রজসুন্দরী লক্ষ্য করলেন মেয়ে-জামাইকে, যদিও এটা আর খবর নয় তাঁদের কাছে—নাতির কাছেও না—অন্তত পঞ্চাশ বার শোনা হ'য়ে গেছে আগে।

লাল টিনের ছাদ কাছে এলো, ঢেউ-তোলা টিন—কী না বলে ইংরেজিতে ? কর্ডন ? করোড ? কর্‌র্‌র্—নাঃ!—চোখে এলো রেলের এঞ্জিন, রেলের লাইন, জেটির সাঁকো, আস্তে-আস্তে বড়ো, তারপর আড়াল ক'রে দাঁড়ালো চিরস্থায়ী চেহারার 'সিংহল'। ফোঁশ্‌শ্। ফোঁশ্‌শ্‌শ্‌শ্। ক্রিং। ক্রিং-টিং-ক্রিং। ক্রিং-টিং-টিং-ক্রিং-টিং! চি-ই-ই-ই-ঈ-ঈ-ক্! হরেক আওয়াজ; কাঁপুনি, ঝাঁকুনি, দুলুনি; এগোনো, পেছোনো, বাঁকানো;

শেষ পর্যন্ত ঐ বিরাট বোবা ফ্ল্যাটের সঙ্গে প্রায় বুকে বুক ঠেকিয়ে দাঁড়ালো চাঁদপুর থেকে চার ঘণ্টায় তিন নদী পেরোনো কনডোর স্টিমার। ছেড়ে যেতে কষ্ট হ'লো তন্ময়ের—এতক্ষণ কী ভিড়, ঘেঁষাঘেঁষি! ঝপাঝপ খালি হ'য়ে যাচ্ছে, ঝাড়ুদার বেরিয়ে পড়েছে সাফ করতে, এই চওড়া ডোরা-কাটা কাঠের মেঝের তারাই এখন খোদ মালিক। এমন কি হয় না যে তারা নামলো না, থেকে গেলো, তারপর—বাবা বললেন না?—ক-ঘণ্টা পরে এই কনডোরই আবার রওনা হ'লো গোয়ালন্দের দিকে, নদীর চুল কোঁকড়া ফেনায় আঁচড়ে দিয়ে লম্বা-লম্বা নদী পেরোলো তাদের নিয়ে, সেই-সব সুখী, ভাগ্যবান, স্বর্গসুখীদের নিয়ে, যারা যাচ্ছে কলকাতায়!

কলকাতা কেমন?

এর মধ্যে এতটা সাফ হ'য়ে গেলো। ডোরা-কাটা তকতকে ঠাণ্ডা-রঙের ডেক—দেখলে খেতে ইচ্ছে করে। আর ঐ সিঁড়ির ঘনব্রাউন রেলিংটাও—কিন্তু না, ওদিকে তারা না, ওটা ফর্স্ট ক্লাশের।

পার হ'লো তক্তা, কনডোর স্টিমার আর সিংহল-ফ্ল্যাটের মাঝখানে একফালি নীলচে দমবন্ধ জল—জলের জেলখানা যেন—কেউ যদি টুপ ক'রে প'ড়ে যায়, আর উঠতে গিয়ে মাথা ঠেকে যায় 'কনডোরে' কি 'সিংহলে'?—ফ্ল্যাটের

ভিতরটাও দম-আটকানো, গরম, গন্ধভরা, এখানেও তো চাকরি করতে হয় কাউকে!—যাক, বেরোলো, আবার একটা সাঁকো, লম্বা ঢালু, পায়ের তলায় দোলে একটু, চলতে-চলতে নাচের মতো লাগে। হাওয়া, আলো, ধুলো, ঘেঁষাঘেঁষি নৌকো, সারি-সারি রেলগাড়ি; চারদিকে দিন, জ্যান্ত দিন, ছটফটে টগবগে দিন—আর খানিক পরেই ঢাকা।

কলকাতা কেমন?

—তা ঢাকাই কী কম? রবার-টায়ার-টকটকে গাড়ি, ঠাণ্ডাকালো তেল-কাপড়ের গদি, আরামভরা নরম গন্ধ, বেগনি-রঙের কাচ-বসানো: তাকালে মনে হয় সমুদ্রের তলা দিয়ে চলেছি—সমুদ্রের তলা দেখিনি অবশ্য, বইয়ে পড়েছি যে-রকম। মজা;—কিন্তু জানলা দিয়ে সোজাসুজি বাইরে তাকানোই ভালো—কত দোতলা বাড়ি, কত গাড়ি, গলি, দোকান, রঙিন লুঙ্গি, রঙিন গেঞ্জি; চাবুকের শিষ, মুখের শিষ, গুনগুন-গানও—গাড়োয়ানরা ফুর্তিবাজ। নাকে, চোখে, কানে শহরটাকে টেনে নিতে লাগলো তন্ময়, আর উল্টো দিকে ব'সে দিদিমা আউড়ে গেলেন ঢাকার গুণপনার গল্প;—নবাবপুরের বাখরখানি, বাবুবাজারের অমৃতি, কালাচাঁদ

কারিগরের প্রাণহরা সন্দেশ, লালবাগের মালাইওলা দই—খাবার সুখ এমন আর কোথায়! 'দু-দিন খাইয়ে-দাইয়ে ছেলেটার একটু তাগড়া ক'রে নে, অনি!'

'এতদিনেও যখন হ'লো না, তখন দু-দিনে কি আর হবে!' অনসূয়া জবাব দিলেন।

'তোদেরও খাওয়া আর ওদেরও খাওয়া!' ব্রজসুন্দরীর নাকের চামড়া কুঁচকোলো।

'ওঁদের খাওয়া কী-রকম তুমি তো এখনো ছাখোনি, মা! এই তো জন্মযুগে যেতে বলেছে একবার, আর নাচতে-নাচতে অমনি চলেছো আমাদের সুদ্ধু সঙ্গে টেনে নিয়ে!'

'আ—হা!' নিবারণবাবু ব্যস্ত হলেন।

'যা ইচ্ছে বল! উঠতে-বসতে এত বলিস, তবু তো তোদের মায়া কাটাতে পারি না! অমন আমার সোনার-চাঁদ ভাইয়েরা, তাদের ফেলে কিনা—আমারই দোষ! আমারই কর্মফল!' ব্রজসুন্দরী দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

'তনু,' নিবারণবাবুর হঠাৎ উৎসাহ উঠলো ছেলেকে শহর দেখাবার, 'এই ছাখ আমরা নবাবপুরের পুলে উঠছি—নামবার সময় কী-জোর—কেমন!—এই সব কাচারি-টাচারি—কত বাদুড়, দেখেছিস, গাছটায়?—এই গির্জে-ঘড়ি, ভিক্টোরিয়া পার্ক—আর এই হ'লো কলেজিএট স্কুল, ঢাকা কলেজ ছিলো আগে—কত বড়ো স্কুল দেখেছিস—'

সত্যি!

দিদিমা আর একটি কথাও বললেন না, মা-ও না—বাবাও একটু পরে চুপ করলেন;—এই-যে পুজোর ছুটিতে ঢাকায় আসা, যা নিয়ে প্রায় একমাস ধ'রে এত কথা, কথা-কাটাকাটি, এমনকি দু-একবার কান্নাকাটি, তা যখন সত্যি হ'লো, সত্যি যখন বিখ্যাত নরুদা-বীরুদার বিখ্যাত পান্না-হাউসে পৌঁছবার সময় এলো, ঠিক তখনই যেন ফুরিয়ে গেলো সকলের সব ফুর্তি, কথা, ঝগড়া।

…কিন্তু অন্য-কাউকে দিয়ে কী করবে তন্ময়? সে যেন একটা স্বপ্নের মধ্যে ঢুকে পড়েছে, আর বেরোতে পারছে না, বেরোতে-যে চাচ্ছে, তাও কি?—বাড়ি! বাড়ি এ-রকম হয়? কত বড়ো-বড়ো ঘর, নোয়াখালির টাউনহলের সমান এক-একটা, আর কত ঘর, ঘরের পর ঘর, আর ঠিক পিছনেই—বলো তো কী?—ঠিক পিছনেই নদী, নোয়াখালির রাক্ষুসে নদী না, ঠাণ্ডা লক্ষ্মী ঝিরিঝিরি নদী; ঝলমল জল, দূরে কাছে নৌকোর ফোঁটা, মাঝে-মাঝে স্টিমার—এত কাছে দিয়ে যায় যে মাঠের মতো লম্বা-চওড়া বারান্দায় ব'সে স্পষ্ট দেখা যায় চাকা ঘুরছে, একটু চেষ্টা করলেই পড়া যায় সারেঙের ঘরের পাশে শাদার উপর কালো অক্ষরে লেখা স্টিমারের নাম। আর-কিছু ভালো লাগে না, আর-কিছু ইচ্ছে করে না: বেড়ানো না, গাড়ি চড়া না, বই—এমনকি

বই পর্যন্ত না ; শুধু ইচ্ছে করে ঘরে-ঘরে ঘুরতে ; ঘর থেকে ঘরে, ঘর থেকে বারান্দায়, বারান্দা থেকে সিঁড়িতে, আবার সিঁড়ি থেকে ঘরে ; মার্বেলের টেবিল, উঁচু-উঁচু প্যাঁচানো কাঠের খাট, বড়ো-বড়ো আয়না, এক-একটা উপত্যকার মতো ইজি-চেয়ার, আর—আর সবচেয়ে নতুন, সবচেয়ে সুন্দর, সবচেয়ে আশ্চর্য—ইলেকট্রিকের আলো। ঐ আলোর জন্য সে সকাল থেকে সন্ধ্যাকে ডাকে, কিন্তু সন্ধে হ'লেও সব ঘরে আলো জ্বলে না ; একটুখানি আঙুলের ছোঁয়াতেই যে-আশ্চর্য সুন্দর আলো ঘর ভাসিয়ে দেবে, তাকেও নাকি অমন ক'রে আটকে রাখে মানুষ ! আহা—তাকে যদি ওরা বলতো সন্ধে হ'লে ঘরে-ঘরে আলো জ্বালতে ;—জঙ্গলের জন্তুর মতো অন্ধকার, যেন রাজ্যি-জোড়া ;—কিন্তু হাত রাখো দেয়ালে, চাপ দাও একটু, অমনি কাচের মুখবন্ধ পেয়ালায় ছুটে আসবে হলদে-শাদা সুন্দর, সুন্দর বিদ্যুৎ ;—আর অন্ধকার মিলিয়ে যাবে যেন কখনো ছিলো না। কিন্তু তাকেও কেউ বলে না, নিজেরাও নিশ্চিন্ত যে যার কাজে ;—একদিন একটা ফাঁকা ঘর একলা পেয়ে সে আর পারলো না—কিন্তু আঙুলে ছুঁতেই—উঃ ! কী-রকম একটা ঝাঁকুনি লাগলো শরীরে, ছোট্টো একটা ভূমিকম্পের মতো—অদ্ভুত ! রাত্তিরে শুয়ে-শুয়ে মনে-মনে আবার সেই ঝাঁকুনি লাগালো শরীরে ; আর পরের দিন একলা ঘরে

হঠাৎ তার ইচ্ছে হ'লো ঐ কাচের বাটিতে হলদে-শাদা আলোর ছুটে আসা দেখবে, এখনই দেখবে, এমন ইচ্ছে যে সে-ইচ্ছা মেটাতেই হ'লো ; দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে একবার জ্বাললো, একবার নেবালো—কী সুন্দর আসে, কী সুন্দর যায়—যদিও দিনের বেলায় তত সুন্দর না—তবু সুন্দর।

'—কী, আলো দেখছো ?'

'—কেমন আলো, ভালো ?'

নরুদার দুই ছেলে, অমল আর নির্মল। বয়সে তার বড়ো দু-তিন বছরের বেশি না, কিন্তু লম্বায় একমাথা, লম্বা ধুতি-পরা ফিটফাট, কলেজিএট স্কুলের (সেই-যে !) চৌকশ ছাত্র দু-জনেই, একজনের ইংরেজি লেখা বেরিয়েছে স্কুল-ম্যাগাজিনে। ঠোঁটচাপা হাসছে তারা, চোখে চিকচিক ফুর্তি। অমল এগিয়ে এসে বললো, 'বাবার আপিশ-ঘরে পাখা চলছে এখন, দেখে এসো যাও। যাও!'

ঠাট্টা! তা ঠাট্টা তো করতেই পারে। এদের কাছে ঠাট্টাই তার পাওনা, লম্বা টেড়িকাটা ফিটফাট অমল নির্মল, কেমন সহজ, সুখী, নিশ্চিন্ত। এদের কাছে সে একটা কী ?

'বেচারা ! কী-রকম লজ্জা পেয়েছে !'

'থাক—ওকে কিছু বলিসনে। বড্ড পড়াশুনো করে কিনা—তাই শরীরে বাড়তে পারেনি।'

দিদিমা! উঠতে-বসতে এই কথা দিদিমার মুখে!—উঃ!

কান পর্যন্ত লাল হ'লো তন্ময়, কিন্তু তাকে রেহাই দিয়ে দু-ভাই চ'লে গেলো বারান্দায়; সকালবেলার নীলনরম নদীর দিকে পিঠ ফিরিয়ে ব'সে গেলো ক্যারম খেলতে, ঠকাঠক শব্দে মিশলো খোলা গলার হাসি।

এদের তুলনায় সে একটা কী?

কী...আমি কী? ছুটিশেষের স্বপ্নশেষের স্টিমারে বিকেলনদীর আলোখেলা দেখতে-দেখতে তন্ময়ের মনে পড়লো তার ছেলেবেলার, আরো-ছেলেবেলার কথা; বাঁশের তীর ছুঁড়ে লাউ-কুমড়ো ফুঁড়েছে, কাঠের তলোয়ারে কেটেছে কচুপাতা—কত ভালো লাগতো!—সেই ইঁটরঙের ছোট্ট কুকুরটা, ইচ্ছে ক'রে পাতে খানিকটা ভাত ফেলতোই ওর জন্য—তবু সারা গায়ে পোকা উঠে-উঠে একদিনে ম'রে গেলো;—বাচ্চা একটা পাঁঠা পুষেছিলো তারপর—মাঠ ভ'রে ছুটোছুটি ওর সঙ্গে—কী মিষ্টি ডাকতো ভাঙা-ভাঙা গলায়, কিন্তু ভারি দুষ্টু, গরম জামা পরবে না কিছুতেই, শীতও নেই ওদের? সেই একবার পুলিশ-লাইনে তাঁবু পড়েছিলো; তাঁবুর মধ্যে ঢুকে শুয়ে পড়েছিলো ঘাসের উপর—আঃ, কী ভালোই লেগেছিলো!—ঠাণ্ডাছোঁওয়া নরম ঘাস, ঘাসের ভিজে-ভিজে মাটিগন্ধ; শুয়ে-শুয়ে ঘুমিয়েই পড়েছিলো প্রায়, মনে হচ্ছিলো সে যেন কোনো বাড়ির ছেলে নয় আর, সে যেন বনের ছেলে, সারাদিন

ঘুরেছে মাঠে, বনে, নদীর ধারে, আর দুপুরবেলা ক্লান্ত হ'য়ে ঘুমিয়ে নিচ্ছে ছায়াগাছের ঝরাপাতার ঝিরিঝিরি হাওয়ায় ;—স্পষ্ট মনে পড়ে সেই মিঠে-মিঠে, মাটি-মাটি, ঘুম-ঘুম গন্ধ।

সুখী ছিলো তখন, নিশ্চিন্ত ছিলো, সুখী ছিলো। সে নিজে যেমন, তেমনি ভালো লাগতো ; অন্য কেউ হ'তে চাইতো না, চাইতে শেখেনি তখনো। শিখলো, যখন কবিতা লিখলো। কবিতা লিখতে আরম্ভ করলো, আর দুঃখও তার আরম্ভ হ'লো সেই সঙ্গে।

সে যদি নির্মল হ'তে পারে? কি অমল? তাহ'লে সুখী হয়?

…ও রকম বাড়িতে থাকা নিশ্চয়ই সুখের। কী করলে ও-রকম বাড়িতে থাকা যায়? টাকা হ'লে, না? টাকা কী ক'রে হয়? নরুদা উকিল, বীরুদা ডাক্তার ;—ডাক্তার হবে? কিন্তু হাসপাতালের ধার দিয়ে হাঁটতেও যে ভয় করে তার। উকিল? কাচারিগন্ধে দম আটকায় দু-মিনিটেই, আর সেখানে সারাদিন!…কিন্তু বড়ো-বড়ো চাকরি আছে; যেমন? হাইকোর্টের জজ! অত বড়ো চাকরি—বাবার মুখে শুনেছে অনেকবার—আর অত বড়ো সম্মানের চাকরি দেশে আর নেই।…তবে তা-ই। ঐ রকম বাড়িতে থাকবে, ঐ-রকম আলো জ্বলবে ঘরে-ঘরে ; যা তার ভালো লাগে সবই হবে,

যা ভালো লাগে না কাছেই ঘেঁষবে না। ঠিক। আর-একটু বড়ো হ'লেই জেনে নেবে কী করলে হাইকোর্টের জজ হওয়া যায়; তারপর পড়বে, পাশ করবে, খাটবে, চেষ্টা করবে, যতদিন না…

স্যর তন্ময়। জস্টিস সোম। জস্টিস স্যর তন্ময়কুমার সোম।…ভালো শোনাচ্ছে ?

'তনু!' বাবা ডাকলেন, আর তন্ময় চোখ তুলতেই : 'ছাখ, পদ্মা ছাড়িয়ে মেঘনায় ঢুকছি আমরা। যাবার সময়—মনে আছে ?'

তন্ময় এতক্ষণ জলের দিকেই তাকিয়ে ছিলো, কিন্তু কিছু দেখছিলো না। এবার তার চোখের সামনে ছড়ালো মস্ত চওড়া শিরশিরে মেঘনা, মেঘরঙের, রাতরঙের, ঢেউতোলা; আর পিছনে ইলিশরুপো-রোদ্দুর-জ্বলা পদ্মা; মাঝখানে পরিষ্কার একটি লাইন দুই নদীকে ভাগ ক'রে দিয়েছে শাদায় আর কালোয়। একবার এদিকে, একবার ওদিকে দেখতে লাগলো তন্ময়, আর হঠাৎ স্টিমারটা একটু বেঁকলো বোধহয়—থিয়েটরের অ্যাক্টরের মতো চমক দিয়ে বেরিয়ে এলো সূর্য, লালপোশাকপরা, লাল, গোল, মস্ত; মস্ত, সমস্ত সূর্য নেমে এলো পদ্মার বুকে, আর-একটা লাল নদী ব'য়ে গেলো শাদা নদীর ভিতর দিয়ে, কিন্তু মেঘনা পর্যন্ত পৌঁছলো না, তার আগেই সূর্যের গলা ডুবলো জলে,

গা কাঁপলো, মাথা ঘুরলো, ছোট্ট লাল টুপিটা তুলে সে যেন বললো, 'বিদায়!' আর বলতে-বলতেই—টুপ্! মেঘনা এগোলো, কালো, আরো কালো: মেঘনা এলো; রাত এলো কাছে; চললো দিন ছেড়ে রাত্রে, আলো ছেড়ে অন্ধকারে, আবার সেই অন্ধকারে, নোয়াখালিতে।

ভালো—অনেক ভালো বনের ছেলে হওয়া! ঢাকা, পান্না হাউস, অমল আর নির্মল, দিদিমা—সব মুছে গেলো অন্ধকারে—এমনকি মা-বাবাও: যেন সত্যি সে এখানকার নয়, এদের কেউ নয়, ঠিকানা ভুল করেছে, বাড়ি ভুল করেছে; সত্যি সে বনের, গাছের, ঘাসের, আকাশের। সত্যি আমি বনের ছেলে। 'সত্যি আমি বনের ছেলে'—ছন্দ দুলে উঠলো মাথায়। ঠোঁট নেড়ে কিন্তু আওয়াজ-না-ক'রে ব'লে উঠলো:

সত্যি আমি বনের ছেলে জেনো

তারপর?

সত্যি আমি বনের ছেলে, জেনো,
সত্যি আমি ঐ আকাশের যেন।

লাইন দুটো মনে-মনে আওড়ালো, আরো লাইন ন'ড়ে উঠলো মনের মধ্যে, আরো কথা, মিল, সেজে-গুজে তৈরি, ডাকলেই চ'লে আসে।

ঐ আকাশের—যেখানে নীল তারা—

ঠিক নীল নয়, সবুজ বরং, কিন্তু উপায় কী?—'যেখানে নীল তারা—'

আমার দিকে তাকায় আত্মহারা—

—ইশ, একটা কাগজ পেনসিল থাকতো যদি পকেটে, কি খাতাটা বের ক'রে নিতে পারতো ট্রাঙ্ক থেকে—একটা পেনসিল কি জুটবে না কোথাও এত বড়ো স্টিমারে? অস্থির লাগলো তন্ময়ের, বুকে ভার, কথার চাপে ফেটে যাবে যেন। মনের কথা যদি বেরোতে না পারে, যদি এখন, এখনই, এক্ষুনি লিখতে না পারে, তাহ'লে কেমন ক'রে বাঁচবে? আঃ—যে-কোনো একটা ছেঁড়া ময়লা কাগজ, যে-কোনো একটা ভাঙা ভোঁতা পেনসিল!···খিদে পেলেই খাবার, ঘুম পেলেই বিছানা; কিন্তু কবিতা পেলেই কাগজ-কলম? দেবে? না কি বলাই যায়?

তন্ময় উঠে দাঁড়ালো।

'যাচ্ছিস কোথায়?' প্রশ্নটি অবশ্য দিদিমার।

'বাবা, চলো না একটু ঘুরে আসি।'

'চল।—আমারও ভালো লাগছে না ব'সে-ব'সে।'

লিখতে যখন পারবেই না, তখন একটু ঘুরে-টুরে ওটাকে ভুলবে, ফেরৎ পাঠাবে—কে জানে কোথায়।

'নিচে যাবে, বাবা?'

'বেশ!'

একতলায় এঞ্জিনের সামনে দাঁড়ালো। কী কাণ্ড, অ্যাঁ!—আর যে-লোকটা ঐ রাক্ষুসে চুল্লিতে কয়লা ঠেলছে—গায়ের ঘাম মনে হচ্ছে গায়ের জামা, দেখাচ্ছে কিন্তু বেশ। কিন্তু এ-কাজ যদি তাকে করতে হ'তো? কেমন লাগে ওর, কেমন লাগে খালাশিদের?—ঐ-তো ধারে-ধারে ওদের ঘর, দু-জন ভাত খাচ্ছে ব'সে—বেশ গন্ধ ওদের ভাতের—কিন্তু গরম বড়ো; এগিয়ে এলো স্টিমারের পোস্টাপিশের কাছে—সুন্দর ঘর, জলঘেঁষা, নিরিবিলি, আর ঠিক-ঠিক খোপের মধ্যে বাঁ-হাতে ডান-হাতে চিঠি ছুঁড়ে দিচ্ছে যে-লোকটা, ওস্তাদ সে! অত চিঠির মধ্যে হারিয়ে যায় না দুটো চারটে? খুব ভারি নীল রঙের খামের উপর খুব সুন্দর হাতের লেখা দেখলে খুলে যদি পড়তেই ইচ্ছে করে? আর ভালো-ভালো মাসিকপত্র? কী সর্বনাশ—এ-রকম পড়েছিলো না কোন গল্পে?

এগিয়ে এলো আরো সামনে—আঃ, কী হাওয়া!—স্টিমারটা ছুঁচোলো সরু শেষ হয়েছে এখানে, সবচেয়ে ভালো জায়গা এটা, এর উপরটাই ফার্স্ট ক্লাশের ডেক—কিন্তু এখানটা কী-সব কলকব্জায় জবড়জং, অজগরের মতো মোটা-মোটা কাছি, তক্তা, ভীষণ চেহারার শিকল—আরে! রাতের কালো নদী কাৎরে উঠলো, জলের উপর সবুজ উজ্জ্বল রাস্তা পড়লো হঠাৎ—সার্চলাইট!

ওটাই? মস্ত গোল চোখ-ধাঁধাঁনো আলো ঘুরলো ফিরলো—ছোট্ট সাহসী বাঁকা-বাঁকা নৌকো ভেসে উঠেই মিলিয়ে গেলো—আর আলোর বাইরে কালো নদীর যেন শেষ নেই, যেন জলভরা পৃথিবীর মধ্যে শুধু এই আলো-জ্বলা স্টিমারটুকুই কোনোরকমে ভেসে আছে।···যখন ফিরে এলো, বাক্স, বস্তা, মাছের ঝুড়ি, আর তারই ফাঁকে-ফাঁকে ব'সে-থাকা মানুষের মধ্যি দিয়ে পথ ক'রে-ক'রে খাড়া সিঁড়ি বেয়ে আবার যখন দোতলায় উঠে এলো, সেই গোলমাল আর লোকজন ভালোই লাগলো তন্ময়ের।

এক জায়গায় গোলমালটা একটু বেশি; চার-পাঁচজন ভদ্রলোক চেঁচিয়ে কথা বলছেন, আরো ক-জন শুনছে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে, আর মাঝখানে কম্বল পেতে ব'সে আছেন এক ভদ্রলোক, দাড়িগোঁফ-কামানো গম্ভীর মুখ, গায়ে ফতুয়ার উপর চাদর, ঘড়ঘড় ক'রে একটা কাঠের চাকা ঘোরাচ্ছেন, আর তা থেকে সুতো বেরিয়ে আসছে লম্বা হ'য়ে। তন্ময় জিগেস করলো, 'ওটা কী, বাবা?'

একটু নিচু গলায় বাবা বললেন, 'চরকা'।'

'একটু দাঁড়াও না, দেখি।' তন্ময়ের মনে হ'লো, বাবার যেন ইচ্ছে নেই, আবার যেন আছেও।

নিজেদের জায়গায় ফিরে এসে জিগেস করলো, 'ও-ভদ্রলোক কে, বাবা?'

'কী জানি।'

'কী কংগ্রেস-কংগ্রেস বলছিলো সবাই ?'

'হবেন বোধহয় কংগ্রেসের কেউ।'

'জানো, বাবা, নোয়াখালিতেই যাচ্ছেন উনি !'

'নাকি ?'

'খুব ভালো, না ?'

'ভালো কেন ?' তাঁর পুলিশের চাকরির কথা ভেবে নিবারণবাবু চকিত হলেন।

কেন ভালো, কী ভালো, তন্ময় বোঝাতে পারলো না, বুঝতেও পারলো না, একটু চুপ ক'রে থেকে বললো, 'কী বলছিলেন ঐ ভদ্রলোকেরা—নন্‌কো—নন্‌কো—নন্‌কো-কী, বাবা ?'

খুব নিচু গলায় নিবারণবাবু জবাব দিলেন, 'নন্‌-কো-অপারেশন।'

'মানে ?'

'মানে—মানে—' নিবারণবাবু কথা শেষ না-ক'রে অন্য দিকে তাকালেন। তন্ময় তাকিয়ে দেখলো, বাবার মুখে দুশ্চিন্তার কালো। সেই সাইক্লোনের খবরে যেমন হয়েছিলো, প্রায় সেইরকম। এও কি তবে সাইক্লোনের মতোই কিছু ?

৬

—হ্যাঁ, তা-ই, তা-ই তো! যে-ঝড় কথা দিয়ে কথা রাখেনি, যে-বন্যা আশা দিয়েও ভাসায়নি, সেই ঝড়, সেই বন্যা, সেই বন্য আনন্দ, সেই বন্য, ভীষণ, ভয়ে-ভরা, ভয়-ভাঙানো আনন্দ।

বন্য আনন্দ, বন্যার আনন্দ নামলো কলকাতা বম্বাই দিল্লি মান্দ্রাজে; আমেদাবাদে, এলাহাবদে; রাওলপিণ্ডি, ত্রিচিনপল্লী, চিদম্বরম, নাগপুর, কানপুর, সাহারানপুরে; মিরাট, সুরাট, তাঞ্জোর, গঞ্জাম, কটক, অমৃতসরে; পাটনা, পাতিয়ালা, কাথিওয়াড়, করাচি, ইন্দোর, লাহোর, পোরবন্দর, ডিব্রুগড়, বেজওয়াদায়।

বন্যার আনন্দ নামলো ঢাকা, চট্টগ্রাম, বর্ধমানে; পাবনা, রংপুর, দিনাজপুরে; সিলেট, শিলচর, আখাউড়া, আসানসোল, বাখরগঞ্জে; বীরভূম, মানভূম, রাঙামাটি, রাজসাহী, বাঁকুড়ায়, কুমিল্লায়; বহরমপুর, সীতারামপুর, মাদারিপুরে; হবিগঞ্জ, করিমগঞ্জ, কিষাণগঞ্জে; নওগাঁ,

বনগাঁ, খাগড়া, সাঁৎরাগাছি, ঝালকাঠি, মুক্তাগাছা, ঘোড়ামারায়; পোড়াদ, মালদ, ঈশ্বরদি, বাগেরহাট, ফজিলহাটে; শান্তাহার, কুচবিহার, কক্সবাজার, কালনা, খুলনা, ধুবড়ি, হুগলি, পটুয়াখালি, মোতিহারি, নীলফামারি, নোয়াখালিতে—এমনকি নোয়াখালিতেও বন্যার আনন্দ নামলো।

মরা, আধমরা, বোকা, বোবা, হাবাগোবা, জবুথবু নোয়াখালিতে বন্যার আনন্দ নামলো। মশাডাকা, পানাপচা, এঁদোডোবা নোয়াখালিতে, ঘিনঘিনে, ঘ্যানঘেনে, ব্যাঙর-ঘ্যাঙর নোয়াখালিতে বন্যার আনন্দ নামলো।

যেখানে কোনোদিন কিছু হয় না, যেখানে মানুষ শুধু যে-কোনো রকমে বেঁচে থাকে, সেই ব্যাংকুয়ো, ইঁদুরগর্ত, মশাডোবা নোয়াখালিতে বন্যার আনন্দ নামলো।

দিদিমা বললেন, 'কী? ব্যাপারটা কী? ইংরেজের রাজ্যপাট কেড়ে নেবে বেঁটেখোট্টা গান্ধী? হরি, হরি!'

মা বললেন, 'তোমার কেষ্টঠাকুরও তো খোট্টা, মা।'

'ব্যাটা বেনে!' বড়ো-বড়ো দাঁত দেখিয়ে দিদিমা হাসলেন। 'বেনেবুদ্ধির দৌড় ছাখো না! ঢাল নেই, তলোয়ার নেই, খামচি মারেঙ্গা! হেসে বাঁচিনে কাণ্ড দেখে!'

শীতের তিন মাস তিন দিনের মতো কেটে গেলো।

হরিচরণ গুহ, নোয়াখালির সবসেরা উকিল, পরমেশ চৌধুরী, সবসেরা মোক্তার; উকিল সুদর্শন সেন, মনসুর রহমান, অবনী তালুকদার; মোক্তার মোতাহার হোসেন, রসময় শূর—মোক্তারি ছাড়লেন, ওকালতি ছাড়লেন। রায়পুরের রাঘবেন্দ্র রায়চৌধুরী ফেরৎ দিলেন রায়বাহাদুর খেতাব; বিবিগঞ্জের হাটে হাজারটাকার বিলেতি কাপড় পোড়ানো হ'লো; চৌমুহুনিতে মদের দোকানে পিকেটিং করতে চ'লে গেলো অরুণচন্দ্র হাইস্কুলের নাইন-টেনের ছেলেরা।

দিদিমা বললেন, 'গান্ধী দিলেন ফোঁশমন্তর নন্দীভৃঙ্গী নাচে—তিড়িং তিড়িং তিড়িং! বিটিশসিংহের মুখের সামনে ছুঁচোর কেত্তন ভূতের নেত্য! দেবে একদিন এক দাবড়িতে সাবাড় ক'রে। বাবা রে বাবা, ওরা কি যেমন-তেমন—"সূর্য নাহি অস্ত যায় সাম্রাজ্যে যাহার!"—জানিস?'

তন্ময় বললো, 'জানি। "স্-স-স্-সূর্য ক্-ক্-কভু নাহি ওঠে স্-সাম্রাজ্যে যাহার!"—কী মুশকিল! রাগলে আর রক্ষে নেই; কোনো কথাই বেরোতে চায় না মুখ দিয়ে। অথচ রাগের মুখেই ঠিক-ঠিক জবাব—

দিদিমা বললেন, 'সেই সিংহের ন্যাজে শুড়শুড়ি! আর কিসের জন্য? বেম্ম ছিআরদাশ যত বক্তিমেই করুক, মহারানীর আমলের মতো সুখশান্তি আর কি কখনো দেখেছি

আমরা, না কি আর দেখবো? আহা—মহারানী! সাক্ষাৎ লক্ষ্মী! মুখখানাই লক্ষ্মীর পিরতিমে!'

'মহারানীকে দেখেছিলে নাকি তুমি?' নারকোল কুঁড়তে-কুঁড়তে অনসূয়া মুখনিচু হাসলেন।

দিদিমা বললেন, 'টাকার গায়ে ছাপানো আছে না—তাকিয়ে দেখিস। আরে বেশি আর কথা কী, মহারানীর টাকাটাও খাঁটি, পুরো এক তোলাই তার চাঁদি। আর তোদের ঐ জজ-রাজার ঠুনকো চাকতিগুলো?'

জজ-রাজার চাকতিগুলো দিয়ে স্বরাজ-নোট কিনছে ছোটো-ছোটো স্কুলছেলেরা। এক বছর পরে স্বরাজ যখন হবে, এক-এক টাকায় পাওয়া যাবে একশো টাকা। আর বড়ো ছেলেরা দলে-দলে মিছিল করছে রাস্তায়; নাগপাড়ার মোটা মন্টুর কলকাতার কলেজে-পড়া দাদা গান বেঁধে দিয়েছে; সেই গান গাইতে-গাইতে নাগপাড়ার, তালতলার, সোনাদিঘির, ঝাউকালীর ছেলেরা দলে-দলে মিছিল করছে রাস্তায়; পরমেশ মোক্তারের যমজ দুই ছোটো ভাই, ঢ্যাঙা লটকু আর ঢোপসা ডলু; নাগপাড়ার শঙ্কর, সুকুমার, রমজান; তালতলার মহেন্দ্র, রামেশ্বর; সোনাদিঘির সুরেশ, আফজল, অমূল্য; ঝাউকালীর বড়ো বাড়ির বড়ো ছেলে অবিনাশ; আরো অনেকে, আর সেই অনেকের মধ্যে জিতু আর সুরথ, তন্ময়ের এক ক্লাশেই পড়ে, কিন্তু

দেখতে বড়োসড়ো ব'লে ভিড়তে পেরেছে দলে; সবাই মিলে মিছিল করছে রাস্তায়, টহল দিচ্ছে শহর, আর দূরে কাছে শোনা যাচ্ছে ঝমঝম গান:

চল, চল, চল রে ও ভাই জীবন-আহবে চল!

আর তন্ময়?

আরো মিছিল, নিশেন-ওড়ানো, বাদ্যি-বাজানো, জয়-জয়-গলাফাটানো; সমস্ত লোক, নানা রকম লোক, হরতাল। বন্ধ সব, দোকানকাজবাজার বন্ধ; হরতাল, করতাল, ধর তাল, তালে-তালে নদীর ধার থেকে একেবারে সোনাপুর পর্যন্ত, সোনাপুরের ডিপটি-হাকিম তকমা-বোতাম সাহেব-সেলাম পুলিশসাহেব, ইস্তক জবরদস্ত মাজিস্টরকে শুনিয়ে দেবে গান:

এ কী করলে ভগবান জাগাতে ভারতের প্রাণ,
পুত্রকন্যা দিলে বলিদান।

স্কুলের অ্যানুএল পরীক্ষা ভালো ক'রে হ'তেই পারলো না। আর ছুটির পরে যেদিন খুললো, সেদিন, আর তারপর আট-দশ দিন ধ'রে জুবিলি স্কুল, অরুণচন্দ্র স্কুল, এমনকি জিলাস্কুলেরও বাছা-বাছা ছেলেরা মিলে রাস্তায় চ্যাঁচাতে লাগলো, 'গবর্মেণ্টের গোলামখানা—আর না! গবর্মেণ্টের গোলামখানা—আর না!' তিন পাড়ার তিন স্কুলে পৌঁছবার সব ক-টা পথে পাহারা রাখলো তারা, শুয়ে পড়লো স্কুলের

ফটকে, সিঁড়িতে, ক্লাশঘরের দরজায়। আর ধবধবে ফর্শা শিবেনবাবু রোদ্দুরে টকটকে হ'য়ে আধময়লা খদ্দরে আর ধুলোমাখা খালিপায়ে আর তেলছাড়া রুখুচুলে ঘুরতে-ঘুরতে বলতে লাগলেন, 'হ'য়ে গেছে! আমাদের হ'য়ে গেছে! ছেলেরা স্কুলে যাচ্ছে চোরের মতো, জামার তলায় বই লুকিয়ে! বাঃ!' বলতে লাগলেন 'বাঃ', আর ছুঁড়তে লাগলেন সিআরদাশের 'বাংলার বাণী' কাগজটাকে গোলপাকানো বলমতো ক'রে শূন্যিতে, আর স্কুলে পিকেটিং করার জন্য ঢ্যাঙা লটকুর আর ঢোপসা ডলুর আর আরো চারজনের পনেরোদিনের জেল হ'লো—সুরথেরও হ'য়েই যেতো, কিন্তু ছেলেমানুষ ব'লে ছেড়ে দিলো—বেচারা! আর চোদ্দদিন পরে সেই ছ-জন যখন ছাড়া পেলো, পরমেশ চৌধুরী জেলদরজায় হাজির, সঙ্গে সুদর্শন সেন আর রসময় শূর, আর ফুলমালা-নিশান হাতে ছেলের দল—তারপর গান ক'রে-ক'রে সবাই মিলে শহরটহল। আর ঐ দলের মধ্যে ভোঁশলাকে ভোঁশলার বাবা দেখে ফেললেন সেদিন, আর বাড়ি এসে দেখতে পেয়েই টুঁটি চেপে ধ'রে এমন মার তাকে মারলেন, যেমন মার ভোঁশলার বাবাও ভোঁশলাকে আর মারেননি।

আর তন্ময়?

স্কুল খালি, জেল ভরতি। আইচদের সতীশ বাপের

রায়বাহাতুরি আর নিজের ম্যাট্রিকুলেশন পায়ে ঠেলে চ'লে গেলো তিনমাসের জেলে ; চাঁদপুরে চা-কুলির মিটিং করতে গিয়ে কুমিল্লার হাজতে লম্বা পাড়ি দিলেন হরিচরণ গুহ, মনসুর রহমান, রসময় শূর ; ফেনিতে পঞ্চাশ ভলন্টিঅর নিয়ে গ্রেপ্তার হলেন সুদর্শন সেন ; সিআরদাসের কথামতো বড়ো জেলখানা থেকে ছোটো জেলখানায় ঢুকে পড়ার জন্য উঠে-প'ড়ে লাগলো সকলে।

আর তন্ময় ?

চরকা ঘরে-ঘরে, ঘর্ঘর চরকা, যত গর্জায় তত বর্ষায় না, তবু খদ্দরই হ'লো ভদ্দর—কিন্তু কিনতে পারে ক-জন ? কিনবে কেন, নিজেই বোনো—তাঁত বসলো সুদর্শন সেনের বাড়িতে খটখট, চরকা কাটো নিজেই খাটো খটখট, চরকা-সুতো তাঁতের মাকু বয়কট !—বয়কটের কামড়ে ল্যাঙ্কাশিঅরে লঙ্কাজ্বলুনি, শিমলে-শীত গরম, লণ্ডনসুদ্ধু লণ্ডভণ্ড। ঝাউকালীর বড়োবাড়ির বড়োদিদির পর্দামেয়ের মিটিঙে গিয়ে মা একখানা খদ্দরশাড়ি কিনে আনলেন।

দিদিমা বললেন, 'হরি! হরি! এর নাম খদ্দর ? আর এই খদ্দরেরই এত নাম! আমি ভাবলাম কী-জানি-কী আজবকাপড় বের করেছে গান্ধী বেনে! এর দাম অষ্ট টঙ্কা ! তা অষ্টগণ্ডা পয়সা দিয়ে চট কিনলেই হয়। এটা পরবি তুই ?'

'দেখি একটা প'রে।'

'শোনো কথা! পুলিশে চাকরি ক'রে বলন্টি হবি?'

'আমি চাকরি করি নাকি পুলিশে?'

'ঐ একই হ'লো!' দিদিমা হাসলেন। 'তোদের পুলিশ-সাহেবের মেমসাহেবকে দেখিস না—কেমন মটর চ'ড়ে গটরমটর! আর তোদের মুন্সেফ-মাসি, পেশকার-পিসি, ডিপটি-বোঠানরা! আর তোকেও তো দারোগা-দিদি বলে হেটকনেষ্ট কেষ্ট ঘোষের বৌ! হুজুগ ক'রে চাকরি খোওয়াবি শেষটায়?'

মা বললেন, 'তুমি একটা খদ্দর পরবে, মা?'

'তার চেয়ে পষ্ট ক'রে বল না আমাকে আর কাপড় দিতে পারবি না তোরা! বছরে চারখানা তো দিস, তারই ঠ্যামক এত!—এই-যে নিবারণ এসেছো; শোনো হে, নিবারণচন্দ্র, একটা কথা শুনে রাখো মন নিয়ে—যে-রকম মতিগতি দেখছি তোমাদের, তোমার দারোগ্গিরি তো ছুটলো ব'লে, এখন হিড়হিড় ক'রে হাজতে-না টেনে নিয়ে যায়, সেইটে ছ্যাখো!—কিন্তু তোমার পাঁঠা তুমি ল্যাজে কাটো, আমার তাতে কিছু না, এই তম্বুটাকে বানের জলে ভাসিয়ে দাও, তাতেও আমার কিছু না;—আমার কথা এই যে তোমরা যা ইচ্ছে করো, যেমন ইচ্ছে চলো, কিন্তু আমি তিরিশ বছর ধ'রে যে-কাপড় পরছি, সেই বাড়োহাতি পঞ্চাশ ইঞ্চি রেলির থানই পরবো আর যে-ক'টা দিন ঠাকুর আমাকে মরণ না দেন।'

বাবা বললেন মা-কে, নিচু গলায়: 'তোমার মা-কে পেলে গবর্মেণ্ট এখন—!'

মা বললেন, 'আহা, মা-র কথা আবার—!'

মা বললেন বাবাকে: 'তনুর পড়াশুনোর কিন্তু ক্ষতি হচ্ছে।'

বাবা বললেন, 'আহা, স্কুলের পড়াশুনো আবার—!'

মা বললেন, 'কিন্তু খাতাভরতি কবিতা লিখলেই-তো চলবে না!'

বাবা বললেন অন্য দিকে তাকিয়ে, খুকখুক কেশে: 'তা—ঐ খদ্দরটা—কোথায় কে আবার—উঃ! কী বিপদেই পড়েছি!'

মা বললেন আবছা হেসে: 'তনুরও চাই খদ্দর।'

বাবা বললেন দপদপ দেশলাইয়ে আধপোড়া চুরুট ধরাতে-ধরাতে: 'যদি কোনো—উপায় থাকতো—যদি কোনো—উপায় থাকতো—তাহ'লে—এ চাকরি আর—! কেন-যে স্কুলমাস্টারি ছেড়েছিলাম তখন!'

মা বললেন, 'ভাগ্যিশ ছেড়েছিলে! দেশে এখন ইস্কুলই নেই তো মাস্টার! সত্যি কি পড়াশুনো উঠে গেলো দেশ থেকে? আর পাশ-টাশ করবে না ছেলেরা? তাহ'লে তনুর কী হবে?'

কী?

বললো জেলফেরতা ঢ্যাঙা লটকু তার জেলফেরতা যমজ

ভাই ঢোপসা ডলুকে : 'চৌরিচৌরায় ভারি-তো দুটো খুন হয়েছে, তাব'লে মুভমেণ্টই উইথড্র করলেন মহাত্মা গান্ধী!'

বললো জেলফেরত ঢোপসা ডলু তার জেলফেরতা যমজ ভাই ঢ্যাঙা লটকুকে : 'বন্ধ! বললেই হ'লো! আমরা তাহ'লে আছি কী করতে!'

কী?

জেলফেরতা ঢ্যাঙা লটকু জেলফেরতা ঢোপসা ডলুকে বললো : 'ছ-বছর জেল মহাত্মা গান্ধীর! ছ-য় ব-ছ-র!'

জেলফেরতা ঢোপসা ডলু জেলফেরতা ঢ্যাঙা লটকুকে বললো, 'হ্যাঁঃ—! বললেই হ'লো! পয়লা জানুয়ারি স্বরাজ না?'

না?

লটকু বললো ডলুকে : 'কই স্বরাজ?'

আর ডলুকে লটকু : 'নাঃ! খামকা ফেল করলুম রে পরীক্ষায়। বেশ হ'তো স্বরাজ হ'লে : পড়তে-টড়তে আর হ'তো না।'

আর তন্ময়?

চটমোটা খদ্দরে ঘামলো টিনের ঘরে জষ্টিমাসের কাঁঠাল-গরমে, ভাদ্রমাসের এঁটেল-গরমে ;—কষ্ট ঠিকই, কিন্তু কষ্টেই সুখ, আর ঐ হাঁটু-দেখানো হাপ্প্যাণ্টগুলোর চেয়ে তো

ভালো !—আর ইশকুল-ছুট লম্বা গরম বড়ো-বড়ো দিন ভ'রে বড়ো-বড়ো খাতা ভ'রে ফেলতে লাগলো কবিতা লিখে—শুধু কবিতা না, গল্পও, শুধু গল্পই না, আবার প্রবন্ধ: ভারতমাতার মহিমা, বঙ্গমাতার বন্দনা, সভ্যতার শয়তানিকতা, নবযুগের অভ্যুদয়—কিছুই বাদ গেলো না, এমনকি, যদিও সে সত্যিকার গ্রাম কখনো চোখে ছ্যাখেনি, তবু প্রকাণ্ড গল্প লিখে এ-কথা প্রমাণ ক'রে ছাড়লো-যে ধানের গোলা, গাছের কলা, মাছের পুকুর আর গোরুর গাড়ি নিয়ে গ্রামই হচ্ছে স্বর্গ।...এই একটি কাজই পারে সে, ব'সে-ব'সে কাগজের গায়ে আঁচড় কাটতে, আর-কিছুই পারে না। বয়সে ছোটো ব'লে জেলে যেতে পারলো না, আর দেখতে ছোটো ব'লে তেমন ক'রে ঝাঁপাতে পারলো না এই আশ্চর্য হৈ-চৈয়ের তাতাথৈ ঢেউতলায়। কিন্তু তা-ই কি? না, সেজন্য না, দেখতে ছোটো ব'লে না; এটা তার দোষ, তার মধ্যে কিছু-একটা নেই যে-কিছুটা অন্য সকলের আছে। যেখানে সকলে যায় সেখানে সে মানায় না; যে-কাজ সকলে করে, আর সকলে মিলে করে, সেখানে সে বেঠিক। কত তার ইচ্ছা, চেষ্টাও কম না, কিন্তু না; মিছিলে চ্যাঁচাতে পারে না, স্কুলদরজায় শুয়ে পড়তে পারে না, এমনকি, চরকা ঘোরাতেও ক্লান্ত লাগে;—ঠিক ক্লান্ত না, কেমন লজ্জা করে, কাউকে যেন দেখাচ্ছে।

আইচদের বাড়ির সতীশ, ঢ্যাঙা লটকু আর ঢোপসা ভলু, শঙ্কর সুকুমার মহেন্দ্র হরিপদ অমূল্য, জিতু আর সুরথ; তার কাছাকাছি বয়সের মুখচেনা নামজানা যত ছেলে আছে নোয়াখালিতে, ভারতের স্বাধীনতার জন্য সকলেই কিছু-না-কিছু করলো; শুধু সে পারলো না, কিছুই না। সে শুধু খাতার পর খাতা ভরালো লিখে-লিখে: কিন্তু সত্যি কি লেখার কোনো মানে আছে, লিখলে কি দেশের দুঃখ দূর হবে, রোজ একটি কবিতা না-লিখে রোজ আধসের সুতো কাটতে পারতো যদি সে, তাহ'লে কি অনেক ভালো হ'তো না, সে কি নিজেও অনেক ভালো হ'তো না তাহ'লে?

৭

আরো এক বছর কাটলো। তন্ময় জন্মের মতো হাফ-প্যাণ্ট ছাড়লো, উপরের ঠোঁটে ছায়া পড়লো তার, গলার আওয়াজ হঠাৎ-হঠাৎ ভেঙে যায়। রোজ একটু-একটু ক'রে পৃথিবীটাই বদলে যাচ্ছে তার চোখে, কানে, মনে। যেন মস্ত হাওয়া-বদল: এক দেশের সীমা ছাড়ায়, আরেক দেশ হাত বাড়ায়; ঘাস, গাছ, আকাশ অন্য রকম, আলো আর ধুলো অন্য রকম; দিন, রাত্রি, ঘুম, স্বপ্ন, সব অন্য রকম। এই বড়ো বদলের সঙ্গে-সঙ্গে একটা ছোটো বদলও ঘটলো—তেমন ছোটোই বা কী—আবার তারা ঢাকায়, সেবারের মতো বেড়াতে না, কিছুদিন থাকতে; হকচকানো পান্না-হাউসেও না, আলাদা একটি বাড়িতে ওয়াড়ির র‍্যাঙ্কিন স্ট্রিটে, ছোটো বাড়ি, ছোটো ব'লেই সুন্দর। ইঁটরঙের একতলা, ঠাণ্ডা শাদা সিঁড়ি, ছাইরঙের শানের মেঝে, দেয়ালঘেরা অনেকখানি জমির মধ্যে নিরিবিলি ঠাণ্ডা। বাবার অসুখ; বারে-বারে জ্বর

হচ্ছিলো; আসতে হ'লো ঢাকায় তিন মাসের ছুটি নিয়ে অসুখ সারাতে।

বাবা বললেন রওনা হবার দিন: 'আর বোধহয় আমরা নোয়াখালিতে ফিরবো না। ছুটির পরে বদলি হবো, দেখিস। তোর কষ্ট হচ্ছে, তন্নু, নোয়াখালি ছাড়তে?'

'হচ্ছে,' মুখচোরা জবাব দিলো তন্ময়, কেননা কথাটা সত্যি না। কষ্ট তার একটুও হচ্ছিলো না, আর সেজন্য লজ্জা লাগছিলো নিজের কাছেই। সত্যি, কষ্ট-তো হওয়া উচিত; কোন ছেলেবেলা থেকে, ভালো ক'রে যখন জ্ঞানও হয়নি, সেই তখন থেকে আছে এখানে—কেন হচ্ছে না কষ্ট? সে কষ্ট পাবার চেষ্টা করলো, মনে-মনে একটা কবিতাও ভাবলো নোয়াখালিকে বিদায় জানিয়ে—আর ঢাকায় পৌঁছিয়ে কবিতাটা কপি ক'রে কাকে-কাকে পাঠাবে, তাও ঠিক ক'রে ফেললো, কিন্তু কোথায় কবিতা, তার মন ছুটেছে রেলগাড়ির হাওয়া, উড়াল দিয়েছে মেঘনাখেয়া পাখি;—আর ঢাকায় আসার ক-দিনের মধ্যেই নোয়াখালিকে এমন ভুললো যেন সেখানে ছিলোই না।

আর ও-রকম হ'লো অনেকটা সতুদার জন্যই।

দিদিমার ভাইদের মধ্যে সবছোটো সতুদা, যে-ভাই ছোটো ব'লে মার খায়নি কোনোদিন, আর মার খায়নি ব'লে যার কিছুই হ'লো না—কিন্তু সেই 'কিছু'টা কী,

কী হ'লো না সতুদার, তন্ময় তা বোঝেনি কখনো—আর এখন, সেই মানুষটিকে অনেকদিন পর চোখে দেখে মনেই করতে পারলো না যে পৃথিবীতে এমন-কোনো ভালো আছে, ঈশ্বর যা সতুদাকে না দিয়েছেন। নরুদা বীরুদার ভাই ব'লে তাঁকে মনেই হয় না; চেহারা অন্য, চালচলন ভিন্ন; কী-সুন্দর কথা বলেন, কী-সুন্দর তাকান মানুষের মুখের দিকে। কখনো দ্যাখেনি তন্ময় এ-রকম কোনো মানুষ; দু-চোখ ভ'রে লক্ষ্য করতে লাগলো তিনি কেমন ক'রে হাঁটেন, হাসেন, বসেন, মুখে তোলেন চায়ের পেয়ালা।

দিদিমা বললেন, 'তোর মাইনে-টাইনে কিছু বাড়লো রে সতু?'

মুচকি হাসলেন সতুদা।

'জন্ম ভ'রেই ম্যাস্টেরি করবি?'

'তা মন্দ কী।'

'আর কলকাতার খরচ! না-হয় উজ্জুগি হ'য়ে সরকারি কলেজেই ঢুকে পড়—পেনশন আছে, আর একটা সরকারি চাকরির পজিশন!'

'আর কি সময় আছে, দিদি, এই চল্লিশ বছর বয়সে?' হেসে চোখ ফেরালেন সতুদা। 'অনসূয়া,'—এই প্রথম তন্ময় কাউকে শুনলো পুরো নাম ধ'রে তার মা-কে ডাকতে,

দিদিমা, নরুদা, বীরুদা সবাই ডাকেন অনি—সতুদার সবই আলাদা!—'তোমার ছেলে নাকি প্রডিজি?'

মা বললেন, 'সে আবার কাকে বলে?'

'তা কবিকে চা দিলে না?'

'খায় না তো; কুলিরক্ত যে!'

'ও, কুলিরক্ত বুঝি?' একটু হাসলেন সতুদা, একটুখানি ঠাট্টা, কিন্তু তখনই তন্ময়ের দিকে এমন ক'রে তাকালেন যে তার ভালোই লাগলো। আর তাই, সতুদা যখন তার কবিতা দেখতে চাইলেন, সে তার সবশেষের খাতাগুলি থেকে সেইটি বেছে তাঁর হাতে দিলো, যে-খাতা আগাগোড়া দপদপ করছে ভারতমুক্তির সাধনা-বেদনায়।

ভেবেছিলো লেখাগুলি খুব জোরালো; ভেবেছিলো চমকে দেবে। কিন্তু সতুদা বললেন কোণঠোঁটে হেসে, 'দেশোদ্ধার না-ক'রেই ছাড়বে না? বাঃ, বেশ, বেশ!—আরো লিখেছো?'

লজ্জা পেলো তন্ময়, জবাব জোগালো না।

'আরো অনেক লিখেছো, না?...এতগুলি খাতা সব?... আবার গদ্য!...কোনটা লিখতে ভালো লাগে তোমার, গদ্য না পদ্য?'

'ক্-কবিতাই ভালো লাগে।'

'আচ্ছা, বলো তো পদ্য আর কবিতায় তফাৎ কী?'

'আমি জানি না।'

'বলো না! ভাবো! ভাবলেই পারবে! তুমি একটা বলো, আমিও একটা বলি : দেখি কারটা ভালো হয়।'

এ-রকম সমানে-সমানে কথা তার সঙ্গে সতুদার! এত সুখ, এত বড়ো সম্মান! আনন্দ চাপতে পারলো না তন্ময়, ঘণ্টার মতো শব্দে হেসে উঠলো খিলখিল।

'বলো! ভাবো!' সতুদার চোখও খুশিতে চকচকে।

তন্ময় বললো, 'স্কুলবইয়ে থাকে পদ্য, আর লোকেরা পড়ে কবিতা।'

'বাঃ! চমৎকার! এবার আমারটা শোনো : পদ্য হ'লো যাতে পদ আছে, আর কবিতা হ'লো যাতে কবিত্ব আছে। ও-দুটো একসঙ্গে থাকে অনেক সময়েই।—কেমন? কোনটা ভালো?'

তন্ময় একটু ভাবলো সতুদার কথাটা।

'আচ্ছা, আরেকটা! বলো দেখি পদ্য আর গদ্যে তফাৎ?'

'এটা খুব সোজা!' তক্ষুনি জবাব দিলো তন্ময়। 'যাতে ছন্দ আছে, মিল আছে, সেটাই পদ্য; আর যাতে তা নেই, সেটাই গদ্য।'

'মিল তো নেই মেঘনাদবধ কাব্যে?'

'বাঃ, ও-তো অমিত্রাক্ষর।'

'ঠিক। যাতে মিল নেই কিন্তু ছন্দ আছে, সেটাও পদ্য। কিন্তু যদি মিল থাকে, কিন্তু ছন্দ না? যেমন ধরো, আমি যদি বলি: কী রোদ্দুর! যেতে হবে অনেকদূর। আঃ, হাওয়া! ঐ-যে ওখানে গাছের ছায়া!—এটাকে কী বলবে?'

তন্ময় মাথা নাড়লো।—'জানি না।'

'আ—ঃ, হেরে গেলে আমার কাছে!—এখন আমারটা শোনো: একটা স্লেট ভ'রে গদ্য লিখে দু-ধার মুছে দিলে যা বাকি থাকে, সেটাই পদ্য।'

আবার হেসে উঠলো তন্ময়, ঘণ্টার মতো খিলখিল।

'এটা কিন্তু আমার না—আরেকজনের বানানো। তুমি দুটোরই জবাব পেরেছো, আমি মোটে একটার। অতএব তোমারই জিৎ!'

রোজ আসেন সতুদা, এসে তন্ময়ের সঙ্গেই অনেকটা সময় কাটান, আর তন্ময়ের মনে হয় যেন স্বর্গ। তারপর সতুদা ফিরে গেলেন কলকাতায়, যাবার আগে তাকে উপহার দিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চয়নিকা। সে-বই খুলে তন্ময়ের মনে হ'লো স্বর্গ।

স্বর্গ, স্বপ্ন। প্রথমঘুমভাঙা ভোরবেলার না-জাগা না-ঘুমের স্বপ্ন, স্বপ্ন দিন ভ'রে, রাত্রে, স্বপ্ন ভেঙে স্বপ্ন। আজি

এ-প্রভাতে রবির কর—রবি মানে সূর্য ?—না ; রবীন্দ্রনাথ। আর কর? নিশ্চয়ই হাত। হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আঁকড়ে ধরেছেন মুঠোর মধ্যে, উড়ে চলেছেন আকাশে তাকে নিয়ে, ঝাঁপ দিয়েছেন পাথারে, আঁধার পাথারতলে পাতালে ; আবার চলেছেন পৃথিবী ছাড়িয়ে দূরে বহুদূরে স্বপ্নলোকে সপ্তস্বর্গপুরে, যেখানে নদীর নিকষে অরুণ রক্ত-আলোর মদে মাতাল ; হাতে হাত ধ'রে নাচছেন ময়ূরের মতো নাচে রে হৃদয় নাচে রে—আনন্দ, কী আনন্দ, ছোটে আনন্দ, ফোটে আনন্দ, রাশি-রাশি আনন্দের অট্টহাসি, অন্ত নেই। আরো, চলো, শুধু চলো, শুধু ধাও শুধু ধাও উদ্দাম উধাও—আর কত ? আর কত দূরে নিয়ে যাবে বলো, কোথায়, কোনখানে, অন্য কোনখানে ?

তন্ময়ের দিন-রাত্রির চেহারা বদলে গেলো। এ যেন সে-পৃথিবী নয়, এতকাল যাকে জেনেছে, আর এই কি সে, যাকে 'আমি' ব'লে-ব'লে সে এত বড়ো হ'লো—আর তার জন্যই এত বড়ো আশ্চর্য পৃথিবী ছড়িয়ে আছে নানারঙিন আকাশতলায়, সোনাজ্বলায়, তারাজ্বলায়, তারই জন্য ?

তারই জন্য।

হাওয়ায় কী মনে পড়ে, বিকেলে মেঘ দেখলে কাঁপে, বৃষ্টি তাকে আনন্দে ভাসায়, ডোবায় তাকে আশ্চর্য দুঃখে একলা ছাতে আকাশভরা সন্ধ্যাচোখ। দুঃখ, আকাশজোড়া

দুঃখ, কেউ নেই তার, অর্থ নেই বাঁচার, যদি মিশে যেতে পারতো সন্ধ্যায়, ছায়ায়, অন্ধকারে! আবার সুখ, অসহ্য ভালো লাগা; যদি পারতো পৃথিবী ভ'রে হাওয়ায় ছড়াতে, যদি পারতো নিজেকে টুকরো ক'রে মানুষের মধ্যে বিলোতে, তবে বুঝি এই ভালো লাগার খিদে মিটতো!

তা পারে না, কিন্তু এমন-কিছু পারে, যাতে সেইরকমই লাগে নিজেকে, যে-কাজ শেষ ক'রে উঠে খাওয়া, খেলা, হাসিগল্প আবার সব ভালো লাগে, মা-বাবাকে আপন লাগে আবার। কী-সব লিখেছে এর আগে—ছি!—তুলে রাখলো সে-সব—নতুন ক'রে লিখতে লাগলো নতুন-কেনা চার টাকা দামের ফাউন্টেন পেনে। ফাল্গুন মাস তখন, লালধুলো রাস্তা, পাতাঝরা গেরুয়াহাওয়া মাঠ, গাছে-গাছে ঝিরঝির, অস্থির; হাওয়া বলে দোলো, হাওয়া বলে ভোলো; দোলো, ভোলো, দোলো; লম্বা কবিতা এলো তন্ময়ের মনে সকালবেলায়, ভালো, খুব ভালো, যেমন আগে সে আর লেখেনি।

তরতর ক'রে ঝ'রে পড়লো সোনালি মুখের কলম থেকে:

আজিকে মোরে   ক্ষণেক তরে
ভুলিতে দাও
এই জীবনের বিরামহারা রোদনে,

আজিকে মোরে ঘুমের ঘোরে
ভুলিতে দাও
আমার চিরসঞ্চিত সাধ-স্বপনে।
আমার চির অশ্রুনীর
কপোলে যাক শুকায়ে,
আমার ব্যথা হৃদয়ে থাক ডুবিয়া,
দহনজ্বালা বেদনমালা
গোপনে থাক লুকায়ে
বহ্নিশিখা আজিকে যাক নিবিয়া।

খাতা থেকে চোখ তুলে আবার :

আজিকে মোরে ক্ষণেক তরে
ভুলিতে দাও
আমার যত—

'তন্ময় সোম এ-বাড়িতে থাকে?' চেঁচিয়ে কে ডাকলো বাইরে। তাকে? তন্ময় কান উঁচিয়ে কলম থামালো। বেশ মোটা গলা—কে? অচেনা কেউ—আর তাকেই ডাকছে না? মনের উনুনে আঁচ পড়লো, কৌতূহল চড়লো। বাইরে ছুটে এসে দেখলো, পাঞ্জাবি-পরা রীতিমতো একজন ভদ্রলোক রাস্তায় দাঁড়িয়ে।

মুচকি হাসলেন তিনি : 'তুমিই তন্ময়?'

তন্ময় তাকালো তাঁর হলদে রঙের মুখের দিকে, দূরে-দূরে

বসানো সরু চোখের দিকে, আর তার চোখে চোখ রেখে ভদ্রলোক আবার বললেন :

'তোমার কবিতা আমি পড়েছি।'

এ-কথা শুনে তন্ময় কেঁপে উঠলো, চোখ আর তুলতে পারলো না।

'"দুন্দুভি"তে পড়েছি, আর "পল্লীবন্ধু"তে আর, "মূর্ছনা"য়,' কথার ফাঁকে-ফাঁকে ইংরেজি এস্-এর মতো আওয়াজ করতে-করতে ভদ্রলোক জানালেন।

—ইশ! ঐ বাজে কবিতাগুলি!

'তোমার কবিতা খুব ভালো লেগেছে আমার,' চোখের পাতা মিটমিট করলেন তিনি—(তাহ'লে ও-সবও কারো ভালো লাগে?)—'তাই আলাপ করতে এলুম। লিটারেচারে খুব ইনটারেস্ট আছে আমার।'

তন্ময় ভাবতে লাগলো কী বলা উচিত।

'আমি ইউনিভারসিটিতে অনার্স পড়ি,' আগন্তুক নিজের পরিচয় আরো বিশদ করলেন। 'টিকাটুলিতে থাকি। আমার নাম বিশ্বরূপ ঘোষ। তুমি আমাকে বিশুদা ব'লে ডেকো,' সস্নেহে হাত রাখলেন তন্ময়ের কাঁধে।

তন্ময় কুঁকড়ে গেলো; মনে হ'লো এঁকে বিশুদা ডাকতে তার ভালো লাগবে না।

'জানো, "দুন্দুভি" আমাদেরই কাগজ।'

এতক্ষণে হাঁ করলো তন্ময়, একটু বেশিরকমই হাঁ।—
'আ-আপনি সম্পাদক?'

'না,' বিশ্বরূপ ঘোষ মুচকি হাসলেন, 'সম্পাদক ব'লে নাম বেরোয় বীরেনের, চালান অবশ্য যোগীনদাই। যোগীন গাঙ্গুলি, বুঝেছো না?'

তন্ময় বুঝলো, যে-সব নামজাদা এখনো তার নাম-না-জানা, যোগীন গাঙ্গুলি তাঁদেরই একজন। কিন্তু নামজাদার নামই তো থাকা উচিত কাগজে? জিগেস না-ক'রে পারলো না, 'চালান একজন, নাম আর-একজনের কেন?'

'ও-রকম শিখণ্ডী রাখতেই হয় আমাদের। যোগীনদা জেলে গেলে তো চলবে না।'

জেলে! তন্ময় থ। 'জ্‌জ্‌জ্‌—' অনেকদিন পরে জল-সহজ 'জ' শব্দটাও আটকে গেলো তার মুখে—'জেলে কেন? ক্‌-কাগজ বের করলে জেল হয়?'

'হয় কখনো-কখনো,' মিটমিট চোখে বিশ্বরূপ ঘোষ জানালেন। তারপর হঠাৎ একটু কাছে স'রে চুপি-চুপি বললেন, 'এই পকেটে যা নিয়ে যাচ্ছি এখন—ধরা পড়লে দেবে ঠুকে দশ বচ্ছর!'

তন্ময় স্তম্ভিত।

তার মুখের ভাব দেখে স্পষ্ট খুশি হলেন বিশ্বরূপ ঘোষ। 'স্‌—আচ্ছা—আজ চলি—স্‌—' খুশিতে স্‌-স্‌

আওয়াজ বেড়ে গেলো তাঁর—'আজ শুধু—স্‌স্‌—আলাপ ক'রে গেলাম—আসবো আবার—স্‌স্‌—তোমার মা-বাবার সঙ্গে আলাপ করবো সেদিন—স্‌স্‌স্‌—প্রায়ই আসবো—কেমন ?'

এ-ভদ্রলোক প্রায়ই এলে কেমন লাগবে সে-কথা ভাবতে-ভাবতে তন্ময় ফিরে এলো। তার পায়ের শব্দে বাবা ডাকলেন, 'তনু।'

তনু দরজার ধারে দাঁড়ালো। বাবা শুয়ে আছেন, মা কাছে ব'সে বেদানার রস নিংড়োচ্ছেন। বাবা জিগেস করলেন, 'কে এসেছিলো রে ?'

'একজন ভদ্রলোক।'

'কে ? অচেনা গলা শুনলাম।'

বিশ্বরূপ ঘোষের খবর তন্ময় সংক্ষেপে বাবাকে জানালো—অবশ্য জেলে যাওয়ার বিষয়টা বাদ দিয়ে।

বাবার মরচে-পড়া মুখ চকচক ক'রে উঠলো। বিছানায় উঠে ব'সে বললেন, 'শুনছো ? তোমার ছেলের কবিতা প'ড়ে দেখা করতে এসেছিলো অনার্স ক্লাশের ছাত্র!—আর-কী বললো তোকে ?'

'কী আবার।'

'আহা, ভালো ক'রে বল না সব কথা।—আবার আসবে বললো ? কবে আসবে ?'

'তা তো ঠিক বললো না।'

'আহা—জেনে রাখলি না তুই? আর বসতেও বললি না, বাইরে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই—অমন ভালো ছেলেটি—সত্যি—!'

মা হেসে বললেন, 'খুব ভালো বুঝি? তাও তো চোখে ছাখোনি।'

'আহা—ভালো না? ভালো ব'লেই তো—কই, সেই বইটা—' বাবা কথা শেষ না-ক'রে হাত বাড়িয়ে দেয়ালের তাক থেকে লম্বা রোগা লাল বইটা নামালেন। সেই 'বোধিনী' থেকে আরম্ভ ক'রে তন্ময়ের যত লেখা ছাপার অক্ষরে বেরিয়েছে সব একসঙ্গে বাঁধানো। পাতাগুলি নানা মাপের, সংখ্যাতেও বেশি না, বইটা তাই দেখতে বড়ো বেঢপ, আর লেখাগুলির কথা ভাবলে তন্ময়ের তো এখন লজ্জাই করে। সত্যি—বাবার বাড়াবাড়ি!

অনেকবার ওল্টানো পাতাগুলি বাবা আবার উল্টে গেলেন। মাথা নেড়ে অস্ফুটে বললেন, 'বাঃ!' তারপর মা-র দিকে তাকিয়ে:

'তুমি—তুমি একবার দেখবে নাকি?'

আড়চোখে বইটার দিকে একবার তাকিয়ে মা বললেন, 'এখন রাখো তো এ-সব, এই রসটুকু খেয়ে নিয়ে চুপচাপ শুয়ে থাকো;—কেন যে আজ আবার জ্বরটা এলো!'

বেদানার রস এক ঢোঁকে গিলে বাবা যেন ক্লান্ত হ'য়ে

শুয়ে পড়লেন। একটু পরে বললেন, 'বলো তো কী হ'লো আমার ?'

'কী আবার হবে। অসুখ করে না মানুষের ?'

'কতদিন হ'লো—এদিকে ছুটিও—'

'তাতে কী ? আরো ছুটি নেবে !'

'নেবো তো, কিন্তু পুরো মাইনে আর ক-দিন !'

'সে তোমাকে ভাবতে হবে না এখন।'

একটু চুপচাপ। হঠাৎ যেন আলো কমলো, কথা থামলো, চুপচাপ। যেমন হয় উজ্জ্বল আকাশে হঠাৎ যখন ছোটো মেঘ সূর্যকে ঢেকে দেয়, পৃথিবীতে ছায়া ক'রে আসে, পাতা নড়ে না, কাক ডেকে ওঠে ক-ক্ক।

লাল বইটায় হাত রেখে বাবা ডাকলেন, 'তনু।'

তনু কাছে এসে দাঁড়ালো।

'আরো অনেক লিখেছিস, না রে ?'

বাবার চোখে-চোখে তনু হাসলো, হাল্কা, লাজুক। তার নিচু-করা মাথাটার দিকে একটু তাকিয়ে থেকে বাবা আস্তে বললেন, 'আচ্ছা। যা।'

৮

আর তন্ময়ের সেই আরম্ভ-করা কবিতা?

দুপুরবেলা ব'সে-ব'সে কবিতাটি সে শেষ করলো; কিন্তু শেষ ক'রে মনে হ'লো তেমন ভালো হ'লো না।

কেন মনে হ'লো এ-কথা?

সকালবেলায় ঘোর ছিলো লেখার, সেটা কেটে গিয়েছিলো বিশ্বরূপ ঘোষের নির্ঘোষে।

বিশ্বরূপ ঘোষ আবার কবে এসেছিলেন?

সেদিন ছিলো শনিবার, পরের মঙ্গলবারেই এসেছিলেন, আর সেই মঙ্গলবারের পরের শুক্কুরবারে। আর তার পর থেকে সপ্তাহে দু-তিন দিন নিয়মিত তিনি আসেন যান, কোনো সপ্তাহে দু-দিন, কোনো সপ্তাহে তিন দিন।

কী-কথাবার্তা হয়?

বিশ্বরূপ ঘোষই নানা কথা বলেন; কলেজের পড়াশুনো,

খবর-কাগজের খবর, স্যর ওঅল্টর স্কটের নভেল, আর তন্ময় চুপ ক'রে শোনে—কি শোনে না।

এমন-কিছু আছে কি, যা তিনি মাঝে-মাঝে, ফাঁকে-ফাঁকেই বলেন ?

'আর-ক-দিন পরেই তোমাকে যোগীনদার কাছে নিয়ে যাবো।'

এ-কথার উত্তরে তন্ময় ?

চুপ।

বিশ্বরূপ ঘোষ ছাড়া আর কি কেউ এসেছিলেন বালক-কবি, কবিকিশোর, সোমকুমার তন্ময়ের কাছে ?

রাধিকাচরণ গোস্বামী, ছোটোখাটো, তেলতেলে, হাসি-হাসি, আধো-কথা, বাঁকাচোখো।

তিনি কী বললেন এসে ?

স্বপ্ন দেখেছেন, ১৭৬ জন্মান্তর আগে তন্ময় আর তিনি একসঙ্গে গোরু চরাতেন বৃন্দাবনের বনে, আর তন্ময় এবারে জন্মেছে শ্রীকৃষ্ণের ·০০০০০৫ অংশ নিয়ে।

সত্যি কি ১৭৬ জন্মান্তর আগে তন্ময় আর রাধিকাচরণ গোস্বামী একসঙ্গে বৃন্দাবনে গোরু চরাতো, আর সত্যি কি তন্ময় জন্মেছে শ্রীকৃষ্ণের '০০০০০৫ অংশ নিয়ে?

জানবার উপায় নেই।

রাধিকাচরণ গোস্বামী কি সত্যি ও-রকম স্বপ্ন দেখেছিলেন?

তাও জানার উপায় নেই।

এ-কথা শুনে তন্ময়ের কী মনে হ'লো?

অবাক লাগলো, হাসি পেলো, একটু দেমাক না হ'লো তাও না।

রাধিকাচরণ গোস্বামী কি প্রায়ই আসেন?

মাঝে-মাঝে, প্রায়ই, প্রায়-প্রায়ই।

কী বলেন?

বেশি বলেন না, হাসেন, চেয়ারে ব'সে পা দোলান, গুনগুন কেত্তন টানেন, চা খান উস্‌প্‌-উস্‌প্‌ আওয়াজ ক'রে, আর চোখ বুজে মুখের মধ্যে ফেলে রসগোল্লা টপ।

যেটুকু বলেন তার মধ্যে বেশি কোন কথাটা ?

'আমাদের ব্রজসুন্দর গৌড়াশ্রমে একদিন নিয়ে যাবো তোমাকে—কবে যাবে বলো ?'

উত্তরে তন্ময় ?

চুপ।

বিশ্বরূপ ঘোষ, রাধিকাচরণ গোস্বামী ছাড়া আর-কেউ দেখা দিয়েছিলো কবিবালক, কিশোরকবি, সোম তন্ময় কুমারকে ?

আর-একজন, পাড়াতেই থাকে, বয়স আঠারো, ছাঁটা চুল, গাঁট্টা জোয়ান, অরুণাংশু ভদ্র।

সে ?

বসে না, ভিতরেই আসে না, রাস্তায় দাঁড়িয়ে গম্ভীর গলায় কথা বলে।

কী বলে ?

স্বাস্থ্য বিষয়ে উপদেশ দেয় তন্ময়কে ; প্রমাণ করে যে স্বাস্থ্য ভালো না-থাকলে কিছুই কিছু না ; ব্যাখ্যা করে স্বাস্থ্য খারাপ হবার চোদ্দ দফা কারণ , ভয় দেখায় যে সব সময় শুধু পড়াশুনো করলে মেরুদণ্ড বেঁকে যায়, চোখ অন্ধ হয়,

যকৃতের সাংঘাতিক অসুখ করে ; জেদ ধরে যে রোজ বিকেলে তন্ময়কে বেড়াতে হবে খানিকটা ; আশা দেয় সে এসে তন্ময়কে রামকৃষ্ণ মিশনে নিয়ে যাবে, দূরেও না, জায়গাও সুন্দর, লাইব্রেরি আছে, স্বামীজীরা আছেন—সে কী। রামকৃষ্ণ মিশন গ্যাখোনি এখনো ? তাহ'লে আজই। রাজি ?

আর তন্ময় ?

'দ্যাখোনি, এখনই ; আজই, রাজি ; মিশন, ভীষণ ; কত মিল।' ভাবে, বলে না।

মিল ভাবা, কবিতা লেখা, কবিতা পড়া, এ ছাড়া আর-কিছু কি করে সে ?

স্কুলে যায়। আরো এক বছরই ছুটি নিলেন বাবা, তাই স্কুলভরতি হ'তে হ'লো।

কোন স্কুলে ? কোন ক্লাশে ?

সেই মোটা থামওলা কলেজিএট স্কুলেই, ম্যাট্রিকুলেশনের ক্লাশে।

স্কুলে কেমন লাগে ?

যত ভয় করেছিলো, তত খারাপ না; যত আশা করেছিলো তত ভালো না।

বন্ধু হ'লো?

দু-জন বন্ধু পেলো ক্লাশে। অশোক মিত্র আর অশোক চাটুয্যে।

অন্যদের বাদ দিয়ে এই দু-জনের সঙ্গেই তার বন্ধুতা কেন?

দু-জনেই পড়াশুনোয় ওস্তাদ। অশোক মিত্র দেখতে সুন্দর, মিষ্টি হাসি, নরম কথা, তার মতোই চকোলেট ভালোবাসে, বাড়িতে আছে বারো ভল্যুম বুক অব নলেজ। আর অশোক চাটুয্যের ইংরিজি তুখোড়, হাতের লেখা পাকা, কবিতা পড়ার গলা ভালো, ঠাট্টা চোখা-চোখা।

অশোক মিত্রের সঙ্গে, অশোক চাটুয্যের সঙ্গে কোথায়-কোথায় মিল নেই তার?

অশোক মিত্র মেকানিক্স পড়ে, মেকানো সেটে হাত পাকায়, দুধ খায় দু-বেলা, কবিতা পড়ে না, মা-র বারণ ব'লে উপন্যাসও 'না, ঠাট্টায় ভোঁতা, মাসবরাদ্দে ভাড়াকরা ঘোড়াগাড়ি চ'ড়ে স্কুলে আসে। অশোক চাটুয্যেও মেকানিক্স

পড়ে, স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে আম খায়, হেঁটো ধুতি পরে, রোজ স্নান করে না, রোববার দুপুরে ঘুমোয়।

অশোক মিত্র, অশোক চাটুয্যে কী-কী বই পড়েছে যা সে পড়েনি?

অশোক মিত্র: বিবেকানন্দর কর্মযোগ, অশ্বিনীকুমার দত্তর প্রেম, এ শর্ট লাইফ অব নেপলিয়ন, সিলেক্টেড স্পীচেজ অব হিজ ম্যাজেস্টি জর্জ দি ফিফথ, বঙ্গমহিলার জাপানযাত্রা, শ্রী ফণীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এস্‌সি. প্রণীত বিজ্ঞানের নবরত্ন, লাস্ট অব দি মোহিকান্স। অশোক চাটুয্যে: ওয়েস্টওঅর্ড হো, জংগল বুক, ভ্যানিটি ফেআর দি লাস্ট ডেজ অব পম্পী, সাইলাস মার্নার, দি লে অব দি লাস্ট মিনস্ট্রেল, কপালকুণ্ডলা, প্রফুল্ল, মেবার পতন, দি বিগিনর্জ অ্যাস্ট্রলজি, এ হণ্ড্রেড ট্রিক্স বাই এ ওঅর্ল্ড-ফেমাস ম্যাজিশিআন।

তন্ময় কী-কী পড়েছে ঢাকায় এসে এই দু-বছরে?

রবীন্দ্রনাথের গদ্য পদ্য মিলিয়ে অর্ধেকের অল্প বেশি, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রায় সব, শরৎচন্দ্র সব, নজরুল ইসলামের অগ্নিবীণা, বীরবলের হালখাতা, প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের ছোটোগল্প, চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তা দেবী, সীতা দেবীর এবং গোগ্রাসে আরো অনেক বাংলা নভেল।

উৎসাহে, উচ্ছ্বাসে, নির্ভুল নিয়মে কোনো পত্রিকা পড়ে কি?

মাসে-মাসে প্রবাসী আর ভারতবর্ষ।

প্রবাসী কেন?

রবীন্দ্রনাথের নাটক, কবিতা, গান, আর মণীন্দ্রলাল বসুর রমলা বেরোয় ব'লে।

ভারতবর্ষ?

বাঃ, শরৎবাবুর উপন্যাস!

আর-কোনো পত্রিকা?

বারীন্দ্রকুমার ঘোষের বিজলী, তারপর আত্মশক্তি, আর মাঝে-মাঝে ভারতী, মানসী ও মর্মবাণী।

ইংরিজি?

দি কাউণ্ট অব মন্টি ক্রিস্টো, আটখানা ডিকেন্স, জেইন আয়ার, পলগ্রেভের গোল্ডেন ট্রেজারিতে শেলি, কীটস, বায়রন, মূর, টেনিসনের কবিতা (বার-বার, বার-বার), ম্যাকবেথ, মার্চেণ্ট অব ভেনিস, ওথেলো (শুধু প্রথম অঙ্ক), লীভস অব গ্রাস (কয়েক পৃষ্ঠা), কন্সট্যান্স গার্নেটের

অনুবাদে টলস্টয়ের তেইশটি গল্প আর চারটি নাটক; এ. এস. এম. হচিনসনের ইফ উইণ্টর কামস, সরোজ অব সেটান, টেলস অব টেরর অ্যাণ্ড মিস্ট্রি, বর্নার্ড শ-র প্লেজেণ্ট প্লেজ (ভূমিকা বাদ দিয়ে), দি পিকচর অব ডরিআন গ্রে।

এ-সব বই পায় কোথায়?

প্রায় সাত ভাগের এক ভাগ কিনে, প্রায় আট ভাগের এক ভাগ উপহারে, প্রায় চার ভাগের তিন ভাগ ধার ক'রে।

সবচেয়ে বেশি বার কোন বই পড়েছে?

গোল্ডেন ট্রেজারি (শেলি আর কীটসের জন্য), অভ্র-আবীর, দত্তা সাত বার, পরিণীতা তেরো বার, আর রবীন্দ্রনাথ যে কত বার তার হিশেব নেই।

কেমন লাগে তার এ-সব প'ড়ে?

ভালো, খুব ভালো, আশ্চর্য ভালো, সবই ভালো। গোরা যত ভালো, ইফ উইণ্টর কামস ততই ভালো; যত ভালো নাইটিঙ্গেল ওড, ততই ভালো গুজরাটি গর্বা।

তাহ'লে কি ছাপার অক্ষরের যা-কিছু-হোক হ'লেই তার হ'লো?

প্রায় তা-ই, কিন্তু ঠিক না। ঈস্ট লিন, কিপস, কিম হাতে পেয়েও সে পড়েনি, আরম্ভ ক'রেও শেষ করেনি। তাছাড়া শ্রীমতী বিশালাক্ষী দেবী প্রণীত ভারতের ইতিহাস (পদ্য), স্বামী অচ্যুতানন্দ প্রণীত হিন্দু কোন পথে, মলাট আর প্রথম আট পৃষ্ঠা ছেঁড়া, অতএব লেখকের নাম-না-জানা পণপ্রথা দূরীকরণের নিমিত্ত কয়েকটি প্রস্তাব, এ গাইড টু ইংলিশ কম্পোজিশন বাই এ গোল্ড-মেডালিস্ট—এ-সব বই পাতা উল্টিয়ে, কিংবা না-উল্টিয়েই সে রেখে দিয়েছে।

বাংলার এমন-কোনো বিখ্যাত, জনপ্রিয়, বহুলপ্রচারিত বহুগ্রন্থপ্রণেতার কি নাম করা যায়, যাঁর বই একখানাও সে পড়েনি ?

শ্রী পাঁচকড়ি দে।

এমন-কোনো বইয়ের কি নাম করা যায়, যা তার জন্মের সময় থেকে, কিংবা আগে থেকে, তাদের বাড়িতে আছে, অথচ সে পড়েনি ?

পাক-প্রণালী, পারিবারিক চিকিৎসা (চামড়ায় বাঁধানো), লাল রেশমে বাঁধানো ৪॥" × ২৮" সরল বঙ্গানুবাদ-সমেত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার পকেট সংস্করণ (দিদিমার)।

স্কুলে কেমন ?

ইংরিজি রচনার খাতায় হেডমাস্টার সিরাজউদ্দিন আহমেদের কাছে অশোক মিত্র পায় দশে সাত, সাড়ে-সাত, আট, অশোক চাটুয্যে আট, সাড়ে-আট, নয় ; কিন্তু তন্ময় কোনো নম্বরই পায় না, শুধু SA সই-করা খাতা ফেরৎ পায়।

কেন ?

কেননা তন্ময় লিখে আনে আট, দশ, বারো, চোদ্দ, ষোলো পৃষ্ঠা ; তাতে থাকে চাঁদের বর্ণনা, ভাবের উচ্ছ্বাস, গরম বক্তৃতা, শেলি কীটসের লাইন, আর শেষ-পড়া বইটিতে পাওয়া চটকদার কোনো নতুন শব্দ।

স্কুল ছাড়া আর কোথায়-কোথায় তন্ময় যায়, কি গিয়েছে ?

কয়েকবার রামমোহন লাইব্রেরিতে, এক এবং অদ্বিতীয় বার ব্রাহ্ম-সমাজে, মাঝে-মাঝে নদীর ধারে, কিন্তু বড্ড ভিড়—রমনা বরং ভালো—কিন্তু সবচেয়ে ভালো আর্মেনিটোলার পিকচার-হাউস।

সেখানে কী ?

সেখানে বায়োস্কোপ। একমাত্র বায়োস্কোপ ঢাকার। বীর এডি পলোর, ভীম এলমোর অদ্ভুত, আশ্চর্য, রোমাঞ্চকর কীর্তি দ্রুত-চলন্ত উজ্জ্বল ছবিতে দেখানো হয় মাসিকপত্রের ধারাবাহিক উপন্যাসের ধরনে সপ্তাহে দু-বার কিস্তিবদল ক'রে। এক সিকি টিকিট; বসতে পায় ঘেঁষাঘেঁষি কাঠের টুলে স্কুলের ছাত্র, কলেজের ছাত্র আর গেঞ্জি-পরা হল্লা-করা ফুর্তিবাজ গাড়োয়ানের দল।

এই উজ্জ্বল চলন্ত ছবি সে কি আগে কখনো দেখেছিলো?

১৯১৭তে নোয়াখালির টাউনহলে প্রথম। ঢেউওলা সমুদ্র, জাহাজ, সাইকেলরেস, রানী মেরির মাইল-জোড়া লম্বা গাউন; আবার ১৯১৮তে কাচারির মাঠে, সেবার দেখালো কামান, আগুন, কুচকাওয়াজ, আর জর্মনরা বাচ্চা ছেলে রান্না ক'রে খাচ্ছে।

কেমন লেগেছিলো?

বাজে, খুব বাজে। (যদিও মুখে বলেছিলো ভালো, খুব ভালো।)

•

আর এখন? বীর এডিকে, ভীম এলমোকে কেমন লাগলো?

প্রথমে অদ্ভুত, আশ্চর্য, রোমাঞ্চকর; তারপর ভালো, বেশ ভালো; তারপর যেন এমন-কোনো বই, যা একবার পড়লেই চলে, কিন্তু অন্য বইয়ের অভাবে আবার পড়তে হচ্ছে।

বীর এডিকে, ভীম এলমোকে ছাড়া আর-কিছু, আর-কাউকে দেখেছিলো?

তৎসহ কমিক দুই রীল। তার মধ্যে মাঝে-মাঝে একজনকে দেখায়, ছোটো মানুষ, ঢোলা ইজের, বাঁকা জুতো, মজার গোঁফ, সং, ঢং, গম্ভীর সুন্দর দুঃখভরা চোখ, হাসি, আর-না হাসি, কান্নাহাসি, চার্লি, চার্লি চ্যাপলিন।

কেমন লাগলো?

প্রথমে মন্দ না, তারপর বেশ, তারপর আশ্চর্য, আরো চাই।

বিশ্বরূপ ঘোষের সঙ্গে যোগীন গাঙ্গুলির কাছে কখনো গিয়েছিলো?

একদিন। অনেক দূরে সেই সূত্রাপুরের গলির মধ্যে বাড়ি। ভাঙা সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠলো। তিনটে-চারটে খালি ঘর, যেন কেউ থাকে না। একেবারে শেষেরটিতে

অমৃতবাজারপত্রিকা-ছড়ানো কম্বল-ঢাকা বিছানায় আসনপিঁড়ি ব'সে আছেন যোগীনদা। ধবধবে রং, জাঁকালো গোঁফ, চোখ বড়ো-বড়ো। অনেক আলাপ করলেন, তার বাড়ির সব খবর নিলেন, রবীন্দ্রনাথের বিষয়ে কথা বললেন, 'দূর হ'তে কি শুনিস মৃত্যুর গর্জন' খানিকটা আবৃত্তি করলেন, তারপর আসতে বললেন আবার, প্রস্তাব করলেন প্রত্যেক রবিবার সকালে এক ঘণ্টা ক'রে রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়বেন তার সঙ্গে।

এ-প্রস্তাব সে গ্রহণ করেছিলো? আবার গিয়েছিলো?

গ্রহণ করেনি। আর যায়নি।

কেন?

ভালো লাগেনি, তাই।

কী ভালো লাগেনি?

ভাঙা সিঁড়ি, ফাঁকা ঘর, বিশ্বরূপ ঘোষের আগ্রহ, যোগীন গাঙ্গুলির কবিতা পড়ার সুর।

রাধিকাচরণ গোস্বামীর সঙ্গে ব্রজসুন্দর গৌড়াশ্রমে গিয়েছিলো?

একদিনও না।

আর রামকৃষ্ণ মিশনে?

অরুণাংশু ভদ্রের সঙ্গে একদিন, সেদিন বেশি ভালো লাগেনি; আর-একদিন একা, সেদিন বেশ লাগছিলো, কিন্তু—

কিন্তু?

ঘুরতে-ঘুরতে দেখলো এক সারি বন্ধ কুঠুরি, শুধু কোণেরটির দরজা খোলা। যেতে-যেতে ভিতরটা চোখে পড়লো; একজন শুয়ে আছেন মেঝেতে—স্বামীজী নন, এখনো হননি, কিন্তু হবেন বোধহয়। কদমছাঁট চুল, ছোট্ট কালো মানুষ, সন্ধ্যা নামলো। এমন মন-খারাপ হ'লো যে আর সেখানে যায়নি।

কী দেখলো সেখানে, যা এমন মন-খারাপ-করা?

মনে হ'লো আলো নেই, প্রাণ নেই, পৃথিবী নেই।

বিশ্বরূপ ঘোষ, রাধিকাচরণ গোস্বামী, অরুণাংশ ভদ্র কি এখনো—

না, বিশ্বরূপ ঘোষ আর আসেন না, অরুণাংশুরও দেখা নেই। রাধিকাচরণ গোস্বামী মাঝে-মাঝে বিকেলে চায়ের

সময় আসেন, তন্ময় তখন নিজের পেয়ালাটি হাতে নিয়ে আস্তে উঠে যায়।

তাহ'লে সে এখন—

হ্যাঁ, চা খায়। সকালে উঠে চা না-হ'লে তার চলে না, আর স্কুলফেরতা বিকেলে চা না-হ'লে তার চলেই না।

খদ্দর পরে? চরকা কাটে?

খদ্দর পরে না, চরকা কাটে না।

ভবিষ্যতের তন্ময়বাবুর কী-কী ছবি এখন আঁকে সে?

একটিই ছবি। কবি, বিদ্বান, গ্রন্থকার, প্রভূতরূপে প্রসিদ্ধ, সহনীয়রূপে দরিদ্র।

এই ছবির পক্ষপাতী তথ্য কী-কী?

তার লেখার অফুরন্ত ইচ্ছা, পড়ার তৃপ্তিহীন তৃষ্ণা, ছন্দে মুগ্ধতা, ভাষায় আনন্দ; তার অনুকরণের স্পৃহা, কোনো-কোনো বিষয়ে বোকামি, সুখদুঃখের বোধের তীব্রতা; একই ভুল দু-বার না-করার চেষ্টা, পরিশ্রমে প্রফুল্লতা; তার কৌতূহল, তার উদাসীনতা, তার সাহস, তার লজ্জা।

আর প্রতিকূল?

ইণ্ডিআন সিভিল সার্ভিস।

মানে?

নরুদা ব্যস্ত মানুষ, মস্ত উকিল, বাড়ির লোকের সঙ্গে একটা কথার যাঁর ফুরশৎ নেই, তিনি একদিন পঁচিশ মিনিট খরচ ক'রে ফেললেন তার জন্য; তাকে বোঝালেন, বুদ্ধি দিলেন যুক্তি দিলেন, প্রমাণ ক'রে দিলেন যত দূর সম্ভব যে তার, তন্ময়ের পক্ষে স্পষ্ট, শ্রেষ্ঠ, অনন্য পথ হ'লো এখন থেকেই আই. সি. এস. পরীক্ষার জন্য তৈরি হওয়া।

তাঁর যুক্তি?

যে টাকা না হ'লে জীবনে কিছুই হয় না, বই লেখাও না; যে আই. সি. এস.-এর মতো রাজতক্ত দুনিয়ায় নেই; যে ইংরেজের বিরুদ্ধে আমরা যতই বলি আর যা-ই বলি না, এ-দেশে আই. সি. এস. পরীক্ষা বসিয়ে দেশের মেধাবী গরিব ছেলেদের অতুলনীয় সুবিধে ক'রে দিয়েছে গবর্মেণ্ট, আর সে-সুবিধে ব্যবহার না-করা তন্ময়ের মতো সত্যিই মেধাবী আর সত্যিই গরিব ছেলের পক্ষে অতুলনীয় বোকামি; যে আই. সি. এস.-এর সম্ভাবনা অসীম, হাইকোর্টের জজ এমনকি ছোটো প্রভিন্সের গবর্নর পর্যন্ত

ওঠা যায়; যে দেশের লোকের উপকারের সুযোগও ওতে প্রচুর, ইচ্ছে করলে গরিবকে দান করা যায়, গরিব আত্মীয়দের সাহায্য করা যায়; যে সুখে, স্বচ্ছন্দে, সসম্মানে দিন কাটিয়ে অবসর সময়ে বই লেখাও তার ভালো হবে; যে বাংলার বড়ো লেখকরা অনেকেই গবর্মেন্টের বড়ো চাকুরে।

যেমন?

বিদ্যাসাগর, মদনমোহন, রমেশচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, ভূদেব, দীনবন্ধু, রঙ্গলাল, দ্বিজেন্দ্রলাল।

প্রতিপাদ্য প্রমাণ করার পর কোন-কোন সম্পাদ্য নরুদা প্রস্তাব করেছিলেন?

নিয়মিত শারীরিক ব্যায়াম, রেভরেণ্ড ডক্টর আর্চিবল্ড হিগিন্স-এর কাছে বিশুদ্ধ ইংরেজি উচ্চারণ অভ্যাস; বিবিধ সাইক্লোপিডিয়ার সাহায্যে সাধারণ জ্ঞান বাড়ানো; গণিতে উন্নতি; ফাঁক পেলেই গল্পের বই-টই না-প'ড়ে কেমিস্ট্রি আর পোলিটিকাল ইকনমিতে প্রাথমিক শিক্ষা এখনই শুরু করা।

শুনে তন্ময়ের কী মনে হয়েছিলো?

ভালো লাগেনি বার-বার গরিব কথাটা শুনতে।

ও-কথাটা বার-বার বলার বিশেষ-কোনো অর্থ ছিলো কি?

ছিলো। লম্বা ছুটির জন্য বাবার মাইনে অর্ধেক, চিকিৎসায় দেদার খরচ, এখন নরুদাই ভরসা।

এই অবস্থার সমস্তটা কি তন্ময় জানে? বোঝে?

কিছু জানে, কিছু বোঝে, কিছু অনুমান করে।

এ-বিষয়ে দিদিমা কিছু বলে তাকে?

'তনু, বড়ো হও, যুগ্যি হও, আমরা-যে তোমার মুখ চেয়েই ব'সে আছি।'

মা?

কথা বলার সময় তাঁর কোথায়? রোগের সঙ্গে লড়াই ক'রেই কাটছে তাঁর রাত্রি, দিন, সপ্তাহ, মাস।

মা-র কী-কী পরিবর্তন লক্ষ্য করেছিলো তন্ময়।

মা-র গলায় আর হার নেই, হাতে শাঁখার পাশে একটি মোটে চুড়ি; মুখে ছলছলে খুশির বদলে ছায়া, চোখে ক্লান্তি, ঠোঁটে ধৈর্য।

দিদিমার ?

মা যে-সব কাজ আগে করতেন, সব এখন করেন দিদিমা, দু-বেলা রান্না ক'রে চার বেলা স্নান করেন; মা যতক্ষণ না খান নিজে না-খেয়ে ব'সে থাকেন হোক বেলা তিনটে কি রাত্তির বারোটা; ঝগড়া করেন না; গলা চড়ান না, একলা ব'সে-ব'সে মাঝে-মাঝে কাঁদেন টপটপ চোখের জলের ফোঁটা ফেলে।

আর বাবার ?

বাবার তো সমস্তই বদল। স্থায়ীরূপে শায়িত, মাঝে-মাঝে আচ্ছন্ন, মাঝে-মাঝেই মুখভরা দাড়ি, আকারে যেন ছোটো ছেলে, গলার চামড়া ঢলঢলে, হাঁটুর হাড় নড়বড়ে, চোখ বোবা, ঠোঁট শুকনো, দাঁত মাটিরঙের, নখ কালো-কালো, আঙুল-ভরা মরা চামড়া, গলায় গোঙানি, মুখে দুর্গন্ধ।

দেখে কী মনে হয় তন্ময়ের ?

বাবা কমেছেন, কমেছেন; একশো থেকে নব্বুই, তারপর সত্তর, চল্লিশ, পঁচিশ, পনেরো; এখন ধিকধিক করছেন তেরো, বারো, এগারোতে।

কিছু মনে পড়ে ?

সেই রামকৃষ্ণ মিশনের কুঠুরিতে আবছা আলোয় শুয়ে-থাকা মানুষটিকে মনে পড়ে।

এ-সব অবস্থা, অবস্থার পরিবর্তন দেখে, বুঝে, লক্ষ্য ক'রে, তন্ময় কি গ্রহণ করেছিলো আই. সি. এস.-এর শপথ?

নিশ্চিন্তে, নিঃসংশয়ে, সর্বান্তঃকরণে প্রত্যাখ্যান করেছিলো।

এমন-কোনো লক্ষণ কি ছিলো যে বাবা এর পরেও কমবেন, এগারো থেকে আট, সাত, পাঁচ, তিন, দেড়, তারপর শূন্যে, শেষ শূন্যে?

সমস্ত লক্ষণ, সম্পূর্ণ আশঙ্কা, নিশ্চিত সম্ভাবনা।

বাবা নেই, থাকবেন না, এ-অবস্থা তন্ময় কি কল্পনা করেছে কখনো?

প্রায়ই করেছে ছেলেবেলায়, মনে-মনে ভেবে কত-যে ভয় পেয়েছে। ভাবতে পারেনি এমন কোনো দিন, যখন বাবা থাকবেন না তবু সে থাকবে। তাই কোনোদিন কোনোখান থেকে বাবার বাড়ি ফিরতে দেরি হ'লে অস্থির হয়েছে কেঁদেছে সে, আর রাত্রে শুয়ে-শুয়ে প্রার্থনা করেছে বাবা যেন বেঁচে থাকেন।

এখন করে না?

প্রার্থনা? মানুষের প্রার্থনা কি কেউ শোনে?

আকুল হয় না?

কই, না তো। শুধু কেমন অবাক লাগে মাঝে-মাঝে। অমন-যে ভিতু মানুষ বাবা, এই সবার বড়ো ভয়ের সামনে কেমন তিনি চুপ! আর সেও কেমন মেনে নিয়েছে—যে-কথা ভাবতে এই সেদিনও তার হাত-পা হিম হ'তো। কল্পনা ক'রে যে-দুঃখে প্রায় ম'রে গেছে, সেটা যখন সত্যি হ'তে চললো, অনেক কারণে তেমন কিছু লাগলো না।

কী-কী কারণ?

রোগের দীর্ঘতা, রোগীর যন্ত্রণা, সেই যন্ত্রণার যে-কোনো অবসানের সর্বস্বীকৃত বাঞ্ছনীয়তা, আর তার নিজের চোখের সামনে উজ্জ্বল, প্রতীক্ষমান, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ভবিষ্যৎ।

বাবার মুখে শেষ কোন কথা স্পষ্ট শুনেছিলো?

ঈশ্বর!

শেষ কোন আওয়াজ?

গলার মধ্যে অবিশ্রান্ত ঘড়ঘড়।

তারপর ?

বাবার মুখে তন্ময় দেখলো শান্তি।

সে-সময়ে সবচেয়ে তাকে কষ্ট দিয়েছিলো কী ?

দিদিমার বুক-চাপড়ে কান্না।

সবচেয়ে খারাপ লেগেছিলো ?

বাবার আঙুলের আংটি খুলে নিয়ে দিদিমা বাক্সে তুলে রাখলেন।

বাবাকে শেষ দেখেছিলো কী-রকম ?

লম্বা চেরা কাঠের সারি উঁচু ক'রে সাজানো, আগুন ধরলো, ধোঁয়া উঠলো, কাঠের ফাঁকে পাশ-ফেরানো বাবার মুখ, আগুনেও নিশ্চিন্ত, ভয় নেই, আর ভয় নেই।

কান্না পেলো ?

পরে, যখন সন্ধে হ'লো, ঘরে লণ্ঠন এলো, একটানা-পাঁচ-মাস-ধ'রে-বাবার-শোওয়া খাট ছিলো যেখানে, সেখানে মা-কে যখন দেখলো কোরা থানকাপড়ে কুটকুটে কালো কম্বলে ব'সে থাকতে।

কেঁদেছিলো ?

আরো পরে, রাত্রে, বারান্দার সিঁড়িতে ব'সে, তারাজ্বলা আকাশতলায়, অল্প একটু।

একটু ?

চমকে উঠেছিলো রেলগাড়ির বাঁশিতে, তারপর রেলগাড়ির শব্দে ডুবেছিলো। রোজই শোনে, কিন্তু সে-রাত্রে অন্য রকম শুনলো, যেন সমস্ত মন দিয়ে ; শুধু-যে অনেক স্পষ্ট তা নয়, যেন অর্থভরা ; টিকাটুলির ঘুন্টি থেকে পল্টনের ঘুন্টি পর্যন্ত একশো-চব্বিশ কি পঁচিশ সেকেণ্ড ভ'রে তাকে, একলা তাকে কী-কথা যেন বললো, ব'লে গেলো, বলতে-বলতে চ'লে গেলো গুমগুম, গুমগুমগুম, গুমগুমগুমগুমগুমগুম, গড়ড়, গড়গড়গড়, গড়গড়ঘড়ঘড়, গড়গড়খড়ঘড়, ঘড়ড়ড়ড়ড়, গড়ড়ড়-ড়ড়ড়ড় গুম, গুমগুমগুম, গুমমমম, ম্ম্ম্ম্ম্ম্ম্ম্ম্ম্—ম্।

কী-কথা ?

৯

কী, তা রাত ভ'রে শুনেও এখনো ঠিক বুঝতে পারলো না তন্ময়। একটা কথা তো না, অনেক কথা, হাজার ; মাঠ, গ্রাম, শহর, বন, জেলা, অন্য জেলার ; অন্ধকারে উল্কি-আঁকা লাল কয়লাফুলকির ; ছোট্ট ঘুমোনো হারিয়ে-ফেলা ইস্টেশনের আর গাড়ি-দাঁড়ানো পা-মাড়ানো কুলি-চ্যাঁচানো ঘণ্টা-বাজানো ইস্টেশনের কথা ; সিগন্যালের সবুজ-লাল তারার, আর সঙ্গে-চলা আকাশ-ভরা চোখের কথা ; আর তার কথা, তার মনের জোয়ার-ডাকা হাজার কথা ; আবার সব মিলিয়ে একই কথা, সব কথাই এক কথা। সে-কথা কী ?

একা, অভিভাবকহীন, এই প্রথম ভ্রমণ তন্ময়ের। শুধু তা-ই বা কেন ; বাবা, মা এবং দিদিমার সঙ্গে ছাড়া এই প্রথম তার স্টেশনে এসে রেলগাড়িতে, রেলগাড়ি থেকে স্টিমারে, আবার স্টিমার থেকে রেলগাড়িতে চড়া। গোয়ালন্দে যখন ভিড়লো রাত প্রায় দশটায় আর কাতারে-

কাতারে কুলি লম্ফেঝম্পেকম্পনে স্টিমার ভ'রে দিলো যেন অসভ্য বর্বর কোল ভিল সাঁওতাল দস্যু অতিষ্ঠ জর্জর ক'রে দিলো সাজানোবাগান মোগলদুর্গ, তখন ট্রেনকামরায় জায়গাদখলে করিৎকর্মাদের তড়িৎগতি লক্ষ্য ক'রে, বিজয়ীবীর সীজরমেজাজ কুলিদের একজনকেও তার আহ্বানে কর্ণপাত করাতে না-পেরে, কলকাতার গাড়ির তাকে ফেলেই ছেড়ে দেবার, আফগান স্টিমারের তাকে নিয়েই প'ড়ে থাকার আশঙ্কা অনুমান ক'রে, একটু যদি ঢিপঢিপ, ভয়-ভয় ক'রে থাকে তার, সেটা কি খুব অবাক হবার? কিন্তু ভয় ভাগিয়ে স্বাবলম্বিতার চেষ্টা করলো। ছোটো বিছানা তোলা সহজ, কিন্তু বইবোঝাই স্যুটকেসটা ভারি, তার উপর কোঁচা আছে, মনিব্যাগ না-হারানো চাই, হাতে আছে ঢাকা স্টেশনের হুইলর স্টলে পথে পড়ার জন্য দেড় টাকায় কেনা থ্রী মেন ইন এ বোট। কয়েকবার চেষ্টা ক'রে বুঝলো, সমগ্র সম্পত্তিসমেত নিজেকে নিয়ে ইণ্ডিআন জেনারেল স্টীম ন্যাভিগেশন কম্প্যানির এস. এস. আফগান থেকে অবতরণ, উপরন্তু ঈস্টর্ন বেঙ্গল রেলওএর ডাউন ঢাকা মেইলে আরোহণ, এ-দুটি কাজের নিষ্কুলিক স্বাধীন সমাধা তার পক্ষে অসম্ভব। অগত্যা রেলিঙে ঝুঁকে উদাসভাবে (সত্যি উদাস না, কিন্তু ভাবটা ফোটাতে চাইলো সে-রকম) দেখতে লাগলো সামনের আলো-জ্বলা শূন্য স্টিমারটাকে; আর যতক্ষণে এবং যখন

এস. এস. আফগানও বিজনতায় অন্তটায়ই অনুরূপ হ'য়ে উঠেছে, ততক্ষণে এবং তখনই দেবদূত, স্বর্গদূত, মুক্তিদূত আকাশ থেকে হঠাৎ নামলো তার সামনে; কোনো আদেশ, নির্দেশ, অনুরোধ কিংবা অনুমতির অপেক্ষা না-ক'রেই স্যুটকেসটা শিরোধার্য আর বিছানাটা কুক্ষিগত ক'রে বললো, 'চলিয়ে।'

মুক্তিদূতকে হারিয়ে ফেলার ভয়ে তারই একান্ত অনুগামিতা স্বীকার করলো তন্ময়: কোঁচা সামলে, পকেট-বিবরে মনিব্যাগের অস্তিত্ব ক্ষণে-ক্ষণেই অনুভব ক'রে, ঘণ্টায় চল্লিশ মাইল বেগে দশ মাইল রাস্তা (সত্যি তা নয়, কিন্তু তা-ই মনে হ'লো) ছুটে এসে ভীষণ লম্বা, ভয়ংকর উঁচু, সাংঘাতিক মোটা, শেষ-পর্যন্ত-ফেল-না-করা রেলমেলট্রেনের যে-কোনো একটা থর্ডক্লাশ কামরার সামনে হঠাৎ থামলো। প্রথমে ভেবে পেলো না কেমন ক'রে উঠবে—তারপর বুদ্ধি ক'রে লাফ দিলো, হাতল ধ'রে শূন্যে একটু ঝুলে থেকে বাঁদরবেয়ে নিরাপদেই পৌঁছলো। কামরাটা প্রকাণ্ড, ৭৮ জন বসিবেক, মাইল-লম্বা চার বেঞ্চিতে বিছানা-জোড়া করিৎকর্মার দল। তন্ময়ের হতাশ চোখ ঘুরতে-ঘুরতে—আরে! এই কোণঘেঁষা ছোটো বেঞ্চিটাই চোখে পড়েনি কারো? না কি ইচ্ছে ক'রে ফেলে গেছে পা ছড়িয়ে শোয়া যাবে না ব'লে, আবার বাথরুমটাও কাছে—ঠিক বাথরুম না, কিন্তু—ঐ আরকি। ভাগ্যিশ আর-কেউ এটা পছন্দ করেনি!

শতরঞ্চির উপর সুজনি বিছিয়ে মুক্তিদাতা ক্ষিপ্র হাত বাড়ালো।

'কত ?'

'বকশিশ দিজিয়ে বাবু দো রুপেয়া।'

তন্ময় শুনেছিলো গোয়ালন্দের কুলিজুলুমের গল্প, তাই দু-টাকার বদলে এক টাকা দিলো। পলকতাকিয়ে সেলাম ঠুকলো দেবদূত, পলকপাতে মিলিয়ে গেলো হাওয়ার মধ্যে হাওয়া হ'য়ে গোয়ালন্দের অন্ধকারে।

'করলেন কী মশাই, আস্ত টাকাটা দিয়ে দিলেন! দু-দুআনা রেট!'

প্রৌঢ় গুম্ফবান মুখের মশাই সম্বোধনে তন্ময় খুশি হ'লো। এমনিও বেশ; জায়গাটা নিরিবিলি পেয়েছে, আলো কম, ভাবটা যেন বক্সে ব'সে নাটক দেখছে। নাটকও মন্দ না; কেউ পান খাচ্ছে, কেউ গান গাচ্ছে; কেউ জামা-টামা খুলে আসনপিঁড়ি ব'সে তালপাখা নাড়ছে, কেউ-বা সকলের শোনার মতো গলা চড়িয়ে প্রমাণ করছে যে জনশ্রুত ভাওয়াল সন্ন্যাসী প্রকৃতপক্ষেই মৃতকথিত পুনরুত্থিত ভাওয়াল-কুমার; কেউ যথাসম্ভব লম্বা হ'য়ে যথাসাধ্য জায়গা জুড়ে চিৎ। কিন্তু বড়ো নাটক কখন? গাড়ি ছাড়বে না?' এত যদি দেরি, তবে আর পাগলতাড়া কুলিকাড়াকাড়ি করেছিলো কেন সবাই? ইস্টেশনেও সাড়া

নেই, পানবিড়ি ক্লান্ত, মিটমিটে আলো টিমটিমে, ঝিঁঝিঁ ডাকছে ঝিঁঝিঁ, ব্যাঙ বলছে ঘ্যাঙর, এদিকে পনেরো দিন আগে পঁচিশ টাকা বারো আনায় কেনা তন্ময়ের কব্জিঘড়িতে এগারোটা বেজে তিন মিনিট হ'লো। ছাড়বে তো গাড়ি, যাবে তো কলকাতায়?

ক্যাঁ-ক্যাঁচ! ক্যাঁ-ক্যাঁচ! এই রওনা? ক্যাঁ-ক্যাঁচ-ঘটাং, ঘ্যাঁ-ঘ্যাঁচ-খটাং—নাঃ, এর দেখছি আড়মোড়া ভাঙতেই রাত কাবার। আবার থামে নাকি? কী মুশকিল—তুমি চললে কখন যে থামছো? এরই মধ্যে স্টেশন? তাই তো, ল্যাম্পোর গায়ে নামও লেখা। হরিবোল! এর নাম যদি রাজবাড়ি হয়—তা চলো বাপু, একটু গা করো। তুমি জগৎবিখ্যাত রেলগাড়ি—ক্যারদানিটা দেখিয়ে দাও না একবার! নাঃ, এই ঢিকশ গাড়িতে বাইরে তাকিয়েও সুখ নেই, শোয়াই যাক।...

ঘুম কিন্তু এলো না। কি এলো যদি, ঠিক ঘুম না, যেন মনে-মনে ভাবা, মনের নীল জলে ডুবসাঁতার। গাড়িও গরজ দেখালো এবার, ছুটলো, খুবছুটলো, গুমগুমগর্জালো, ঝিকঝিকঝাঁকালো, চললো কলকাতায়। যাচ্ছো কোথায়? কলকাতায়। যাচ্ছো কোথায়? কলকাতায়। গাড়ি চলছে কলকাতা, গাড়ি বলছে কলকাতা।

ট্রেনদোলায় শুয়ে থাকলো তন্ময়, ঘুমজাগার নরম হাতে

আরামে। মুখ, মানুষমুখ, কথা, গলার আওয়াজ, ছবি, দৃশ্য ; ঘুমজাগার নীল জলে ঢেউয়ের পর ঢেউ, ট্রেনদোলার ঢেউতলায় ডুবের পর ডুব। ডুব-ডুবছে সে, আরো ডুব, নীল জল সবুজ, কুঁড়িসবুজ, আরোসবুজ, বেগনি ; কালো···· কালো···আলো···শীতসকালে শিশিরঘাসের আলো ; মোজা, অলস্টর, টুপি ; চলেছে আঙুল ধ'রে ভিজেসবুজ ঘাসের পথে রুপো-হাওয়ায় হাসতে-হাসতে, খুশি হওয়ার সুখী হাওয়া ছড়িয়ে, চলেছে বাবার সঙ্গে···না তো, নোয়াখালি না, ঢাকা, রাস্তা, সামনে তাদের স্কুল, পাশে ব্যাঙ্ক, খশ ক'রে সাইকেল থামলো পিছনে, পিঠে হাত রেখে ক্ষিতীশ বললো, মোটা ক্ষিতীশ। কতবার শুনলো ক্ষিতীশের গলা আস্তে একা পান্না-হাউসে ফিরতে-ফিরতে, 'অশোক চাটুয্যে ফার্স্ট, অশোক মিত্র···, ···, ···, সবাই কিন্তু শিওর ছিলো যে তুমি···' ; আমি ? কিছু না, কিছু পারি না, পরীক্ষায় স্কলারশিপও না। মা-কে বললো অন্ধকার বারান্দার কোণে, আর মা বললেন তোর কবিতার একটা বই ছাপালে, বই ছাপা হ'লো, একটা, আর-একটা, অনেক বই, তন্ময়কুমার সোম প্রণীত, গম্ভীরবাঁধানো গম্ভীর-দাঁড়ানো ; কবি, গ্রন্থকার, অধ্যাপক তন্ময় সোম, তন্ময়কুমার, ২২২-১-১, কর্নওয়ালিস স্ট্রিট, স্বপ্ন, স্বপ্নশহর কলকাতা। 'যাবি কলকাতায় কলেজে পড়তে ? তোর সতুদা

লিখেছেন—' ; মা-র পরনে থান, খাটো চুল ঘাড় পর্যন্ত ;
ধূপদানির লাল ছায়া মা-র মুখে, লাল পাড়ে জলজলে ;
বৃষ্টি, বৃষ্টি-পড়া সকাল, চা, চিঁড়েভাজা, কী বৃষ্টি !—
আর ঐ বৃষ্টিভিজে বাবা এলেন ঠকঠকঠাণ্ডায়, মা বললেন
কী কাণ্ড এই সেদিন জ্বর থেকে—; জ্বর, তারপরেই
আবার, রোজ—না ! এই-তো বাবা বারান্দায় ব'সে,
মা-ও, দিদিমাও ; সবাই চুপ, কিন্তু সবাই খুশি, কী যেন
হয়েছে, কী যেন হবে, যাতে সবাই সুখী। বাবা
ডাকলেন 'তনু।'

স্পষ্ট শুনলো বাবার গলা, তন্ময় তাকালো। আস্তে
চোখে ভাসলো ট্রেনের কামরা, গাড়িবোঝাই ঘুম, ঘুমের
গাড়ি, আমিও ঘুমিয়েছিলাম ? উঠে বসলো, ঘড়িতে দেখলো
তিনটে। হঠাৎ মনে পড়লো ঢাকার স্টেশন, প্ল্যাটফর্মে রোদে
দাঁড়িয়ে মা, গাড়ি ছাড়লো, চললো, জোর চলছে এখন,
বলছে কলকাতা, কলকাতা কলকাতা কালযাবো কলকাতা,
এই এলাম কলকাতা কালথেকে কলকাতা। শুধু এই ?—না,
আরো, অনেক।

তন্ময় বাইরে মুখ বাড়ালো। হাওয়া, মস্ত রাত কালো।
দেখবার কিছু নেই, কিন্তু এই রাত্রিটাই দেখবার। আলো-
জ্বলা গাড়ির লম্বা ছায়া কাঁপছে আলোছায়ায় থরথর,
টেলিগ্রাফের ঢেউগড়ানো আবছা তার, আর তারও পরে

চোখ পাঠালে একটু বোঝা যায় মাঠ, গাছ, সারিগাছের আরোকালো, কি ঘমঘম সাঁকো যখন পেরোয়, তখন নিচে তাকিয়ে তারার ছায়া জলে। চলেছে রাত্রি ভ'রে অন্ধকারে, ভয় নেই—কে ?

সে। সে চলেছে এই রাত্রে, ঘুমের অন্ধকারে একলা-জাগা রেলগাড়ি; হাওয়া সে, হাজার হাওয়া, ছড়িয়ে পড়লো মাঠে, গ্রামে, জঙ্গলে, জেলা ছেড়ে অন্য জেলায়, দেশান্তরে তেপান্তরে দিগন্তরে; তারা সে, হাজার, আকাশ ভ'রে দিলো, এক সূর্য থেকে আর-এক সূর্যে হাজার আলোবছর পার হ'য়ে পৌঁছলো, আলো, তরঙ্গ, কম্পন, বিদ্যুৎ, অণু, পরমাণু, সে।

এমন তার কখনো কোনোদিন লাগেনি, যেমন সেই ঘুমের গাড়িতে একলাজাগা শেষরাত্রে। শক্তি তার অসীম, মুক্তি অবাধ, আনন্দ অফুরন্ত। পৃথিবী তার, পৃথিবীর পর পৃথিবী—কেননা পৃথিবী তো একটা না, যত মানুষ ততটাই পৃথিবী, প্রত্যেকের একটা ক'রে। প্রত্যেকের একটা ক'রে দিন, তাই একদিন মানে একটা দিন না, যত মানুষ ততটাই দিন। সেই অসংখ্য দিনরাত্রির অগণ্য পৃথিবী তার, আর তাই তো তার কাছে হাত পেতেছে এই হাওয়া, রাত্রি, আকাশ, আকাশের তারাবদল, দিগন্তের আলোবদল, দিগন্তের অশান্তি।

কিসের জন্য? কী চায়?

আমার মনের অন্ধকারের রাত্রি ভ'রে
হাজার কথার কলরোল—

ঠিক! এইজন্য। কথা চায়, পৃথিবী তার কাছে কথা চায়।

আমার মনের মত্ত আঁধারে হাজার কথার কলরোল—

এই? না। কী না—?

আমার মনের অন্ধকারের রাত্রি ভ'রে
হাজার কথার কলরোল—

কোনটা? কোনটা নেবে, কোনটা ফেরাবে? চায়, আসতে চায়, দলে-দলে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে। তন্ময় চুপ ক'রে তাদের কানাকানি শুনলো, শুনলো কানে, মনে, ঝরছে তারা থেকে ফোঁটা-ফোঁটা, স্বপ্নের মধু, স্বর্গের শিশির। দেখলো আকাশে কথার ঝাঁক উড়ে আসছে, জোড়ে-জোড়ে মিল, কেউ নীল, কেউ বেগনি, সবুজ; কাছে এলো, নেচে-নেচে নামলো, ঘিরে ফেললো।

আমার মনের মত্ত আঁধারে হাজার কথার
ঘুম ভেঙে যায়, যেন পাখা পায়, আকাশ-তারার
বিশাল রাত্রে যেন উড়ে যায় হাজার হাওয়ায়।

পায়রা-পায়ের স্বপ্নকোমল স্বর্গছোঁওয়ায়
কারা নেমে আসে মনে, মনে-মনে যেন ব'লে যায়,
'আমরা তোমার মত্ত মাতাল, আমরা তোমার।'

যেখানে মনের মত্ত মগ্ন পাতাল-পাথার
সেখানে তারাই ; তারাই ভীষণ।—কী অন্ধকার
মনের গোপন হাজার পাহাড়ে, গুহার ছায়ায়।

আবার তারাই হাজার-হাজার হালকা পাথায়
উঠে আসে, ওড়ে, ওড়ে আর ঘোরে, হাওয়ায় ছড়ায়
পায়রা-পায়ের স্বর্গশিশির স্বপ্নছোঁওয়ার।

আমি ব'সে থাকি চুপ ক'রে, আর হাজার-হাজার
কথার পাথায় আকাশ-তারায় ওঠে তোলপাড় ;
মনের আকাশ ফেটে তারা ফোটে, তারায়-তারায়

জ'লে ওঠে মন, দূরে চলে মন, পাতাল ছাড়ায় ;
ফোটে ফুল হ'য়ে ঘাসে আর গাছে, ময়ূর-পাথায়
বেগনি-সবুজ ; আর লোটে সোনা বাঘের থাবার।

পাতাল-কালোয় দুঃস্বপ্নের ভীষণ কাতার ;
আকাশ-আলোয় স্বপ্ন-জোয়ার স্বর্গ-ছোঁওয়ার ;
ওরা বার-বার আসে যায়, আর বলে বার-বার,

'আমরা তোমার মুক্ত আকাশ, আমরা তোমার।'

এদিকে পৃথিবীর আহ্নিক গতির আবর্তনের নিয়মে অর্ধেক গ্রহে রাত্রি শেষ হ'লো ; ভোর হ'লো জাপান চিন বর্মায় ; ইস্ফলে লামডিঙে ; কেঁপে উঠলো হুগলি জেলায় কালো পরদা ; ভোর হ'লো শিলঙে, কালো পরদা কাঁপলো, ভোর হ'লো বরিশাল খুলনায় যশোরে ; আর যশোরে যখন আগুনরঙের কাঁচা রোদ উঁচু গাছের চিকন পাতা ছোঁয়-ছোঁয়, তখন পরদা উঠলো নৈহাটি স্টেশনের দেড় মাইল আগে, ব্যারাকপুরেও, দমদমেও ; অর্ধেক পৃথিবীতে যখন ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের উনতিরিশে জুনের সন্ধে, রাত, ঘুমরাত, তখনই এসে হাজির হ'লো ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের তিরিশে জুন বাংলাদেশে, রাজধানীতে, বাংলার রাজধানী কলকাতায়।

কলকাতায় ভোর হ'লো। জলধোয়া কালো রাস্তায় রোদ পড়লো লাল, অ্যাসফল্টের মিঠেতার গন্ধ উঠলো, ট্রাম চললো টংটং। ভবানীপুরে হরিশ মুখার্জি রোড থেকে বেণীনন্দন রোড ধ'রে রসা রোড নর্থ-এ পৌছলেন আধবয়সী ভদ্রলোক, পাঞ্জাবি পরা, স্টেটসম্যান হাতে, গালে একদিনের দাড়ি।

থ্রী মেন ইন এ বোট-এর পিছনের দুটো শাদা পাতায় কবিতাটা ধ'রে গেছে। মজার হয়েছে দেখতে পেনসিলের বাঁকা অক্ষর। দাগা বুলিয়ে দু-একটা কথা স্পষ্ট ক'রে পুরোটা একবার পড়লো, তারপর বই বন্ধ ক'রে বাইরে

তাকালো। আরে, ভোর! কোন স্টেশন? লেখা-টেকা তো দেখছি না কোথাও—কিন্তু বেশ বড়ো। কলকাতা না তো?—ধ্বক ক'রে উঠলো বুকের মধ্যে। জিগেস করবে? কাকে? কামরায় উঠে বসেছে কেউ-কেউ, চোখ-মুখ ঘুমে ফোলা, গোঁফওলা ভদ্রলোক গ্রম-চা ডাকলেন, ভবানীপুরে বেণীনন্দন রোডের মোড়ে একদরজার সবুজ ট্র্যামের ফর্স্ট ক্লাশে উঠে পড়লেন পাঞ্জাবি-পরা ভদ্রলোক, গোঁফ নেই, গালে একদিনের দাড়ি।

মাটির ভাঁড়ে একপয়সার চায়ে চুমুক দিয়ে গোঁফওলা ভদ্রলোক বললেন অন্য-একজনকে: 'না, দমদমে ধরবে না, ব্যারাকপুরের পরেই শ্যালদা।'

'ধরবে না,' 'শ্যালদা'; দুটো কথাই খচ ক'রে কানে বিঁধলো। 'ধরবে না' মানে থামবে না, দাঁড়াবে না—; 'দমদমে দাঁড়াবে না', এ-ই ভালো, অনুপ্রাস বেশ, কিন্তু দমদমের কি আর অনুপ্রাসের দরকার? ইংরেজিতে বলে 'ছোঁবে না'। একই কথা এক-এক ভাষায় এক-একরকম—মজা। আমরা বলি, 'তোমার বয়স কত?', ইংরেজিতে বলে, 'তুমি কত বুড়ো?', আর ফ্রেঞ্চে নাকি জানতে চায় 'তোমার কত বছর আছে?'

সাজানো ট্রে হাতে তকমা-আঁকা বাবুর্চি গেলো। সত্যি! চা খেলে হয়; খিদেও যেন চা, টোস্ট, ডিমের

লোচ—কিন্তু এত লোকের সামনে ? তা চা অন্তত—ডাকবে ? ঐ তো ফিরে যাচ্ছে লোকটা—চ্যাঁচাবে ? নেমে গিয়ে ছুটবে পিছনে ?—থাক—দেখা যাক—আবার যদি—ভাবতে-ভাবতে গাড়ি ছেড়ে দিলো।

এবার স্টেশনের নাম দেখতে পেলো। নৈহাটি, জংশন। জংশন, দমদম। দমদমে 'ধরবে না', এর পর ব্যারাকপুর, আর তার পরেই—। শেয়ালদ, শিয়ালদহ ; এই কি রবীন্দ্রনাথের শিলাইদহ, শিলাইদ ?—তা কী ক'রে হবে, ওটা-তো স্টেশন—আর শিলাইদ নদীর ধারে না ? সতুদাকে জিগেস করবে আজই।

আসবেন-তো স্টেশনে ? লিখেছিলেন টেলিগ্রাম কোরো, স্টেশনে থাকবো। টেলিগ্রাম সে কালই করেছিলো—মানে পরশু—পেয়েছেন তো ? বাঃ, পাবেন না কেন ? ভুলে যান যদি ? হ্যাঁঃ, সতুদা ও-রকমই কিনা ! যদি হঠাৎ অসুখ করে ? তবে কি আর-কাউকে না পাঠাবেন। যদি অ্যাক্সিডেণ্ট হয় রাস্তায় ? পাঁচটা-ছ' মিনিটে—রেলের পাঁচটা-ছ' মিনিটে, কলকাতার সাড়ে-পাঁচটায়, আর তার কব্জিঘড়িতে ঢাকার পাঁচটা-আটত্রিশে গাড়ি পৌঁছবে। তার ঘড়িতে এখন পাঁচটা-আঁট, এতক্ষণে সতুদা কি বেরিয়েছেন ? কোনো অ্যাক্সিডেণ্ট যদি ?

সেণ্ট্রাল অ্যাভিনিউ দিয়ে দক্ষিণমুখো একটা গাড়ি,

বেন্টিংক স্ট্রিট দিয়ে দক্ষিণমুখো আর-একটা লরি, একটাতে লেখা গর্ডন্, হিউলেট অ্যাণ্ড কোং, আর-একটায় কর্পোরেশনের ময়লা বোঝাই, একটুর জন্য ধাক্কা বাঁচিয়ে, প্রায় নাকে নাক ছুঁইয়ে একসঙ্গে থামলো পুলিশের খাড়া বাহুর সামনে এসপ্লানেডে; আর সেই সুযোগে চৌরঙ্গি পার হ'য়ে ধরমতলার মোড়ে এলেন আধবয়সী ভদ্রলোক, গায়ে পাঞ্জাবি, পাৎলা উড়ু-উড়ু চুল, ৩০ জুন ১৯২৫ তারিখের টাউন এডিশন স্টেটসম্যান হাতে।

আর আটাশ মিনিট, সাতাশ, পঁচিশ। দু-দিকে অদ্ভুত চেহারার বাড়ি—বাড়ি এগুলো? ঢালু ছাদ, মস্ত লম্বা, বিরাট উঁচু চোঙের মুখে ধোঁয়া উঠছে—কী? হাণ্টলি পামারের টিনে যেমন ছবি থাকে, তেমনি না? ছবিতে যা-ই হোক, দেখতে ভারি বিশ্রী তো। কী হয় এখানে? বিস্কুট বানায়?

অন্যেরা জিনিশ গোছাতে লেগে গেছে; দেখাদেখি তন্ময়ও বিছানা গুটিয়ে তৈরি হ'লো। থ্রী মেন ইন এ বোটটাও দেবে ওর মধ্যে? নাঃ, হাতেই ভালো, বই-হাতে ট্রেন থেকে নামলে ভালো দেখায়—আবার সতুদাও আসবেন। আসবেন তো?

ধরমতলায় ফলের দোকানের সামনে চারদরজার হলদে ট্র্যাম ধরলেন মাঝবয়সী ভদ্রলোক, না-কামানো গাল,

উড়ু-উড়ু চুল, হাতে ভাঁজ-করা খবরকাগজ, নামের 'ম্যান'টুকু পড়া যাচ্ছে, হয় স্টেটসম্যান, নয় ইংলিশম্যান।

ব্যারাকপুরে হালকাছুঁয়ে গাড়ি ছুটলো। আর কুড়ি মিনিট, আঠারো মিনিট। একটু পরে-পরেই হাওয়াধুলোয় স্টেশন উড়ে যাচ্ছে—এত কাছাকাছি স্টেশন কেন, কোন গাড়ি দাঁড়ায়? এ-গাড়ির আর-কিছুতে মন নেই এখন, চলেছে কলকাতায়, বলছে কলকাতা, এইএলাম এইএলাম এইএলাম।

ঠিক লিখেছিলো তো টেলিগ্রামে? রীচিং থর্টিএথ? স্টার্টিং টোএন্টিনাইন্থ? রীচিং টোএন্টিনাইন্থ? স্টার্টিং থর্টিএথ? কোনটা? যদি লিখে থাকে স্টার্টিং থর্টিএথ, তাহ'লে-তো সতুদা এখন নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছেন। যদি লিখে থাকে রীচিং টোএন্টি-নাইন্থ, তাহ'লে-তো কাল এসে ফিরে গেছেন, আজ নিশ্চয়ই আবার আসবেন না, হয়তো উল্টে টেলিগ্রাম করেছেন এতক্ষণে, আর মা ভাবছেন হ'লো কী।—ঠিক! পৌঁছিয়েই মা-কে আবার টেলিগ্রাম, রীচড সেফলি, 'সেফলি'-টার দরকার নেই, কিন্তু ও-ই দস্তুর, আর শুধু 'রীচড' শোনায়ই-বা কেমন—; কিন্তু সতুদাকে কী লিখেছিলো?

চোখ বুজে টেলিগ্রাফ-ফর্মের উপর তার হাতের লেখার ছবিটা মনে আনার চেষ্টা করলো: রী-চি-ং থ-র্টি-এ-থ। তা-ই তো মনে হচ্ছে। আর এই এত সহজ কথাটায় ভুলই বা

হবে কেন? কিন্তু ভুল মানেই ভুল, ওর আর কেন নেই। স্টীচিং লিখেছিলো? ঠিক?…না স্টার্টিং? থর্টিএথ?… না টোএন্টিনাইন্থ?

আচ্ছা মনে করা যাক টেলিগ্রামে ভুল লিখেছিলো, কিংবা পৌঁছয়নি, সতুদা স্টেশনে এলেন না: তাতে কী? ২২-২-বি হরিশ মুখার্জি রোড, ভবানীপুর, ট্যাক্সি নিয়ে যেতে পারবে না? ভাড়া? ওঃ, পকেটে তার অনেক টাকা। পাঁচটাকার নোট, টাকা চারটে—না পাঁচটা? খুচরো, কত? মা দিয়েছিলেন পনেরো টাকা, আসবার সময় আরো পাঁচ: ঘোড়াগাড়ি চোদ্দ পয়সা, রেলটিকিট (লাল রঙে BY MAIL) ছ-টাকা কত আনা, বই দেড় টাকা, স্টিমারে চা-রুটি চার আনা, ফাউলকারি-বকশিশ চোদ্দ; গোয়ালন্দে কুলি এক টাকা, নারানগঞ্জে তিন আনা, ঢাকা স্টেশনে চার পয়সা—এই তো। কত হ'লো? তা টাকা দশেক আছে—আছে তো? তন্ময় ব্যাগ খুলে উঁকি দিলো—টিকিট? ছোটো খোপে—ঠিক! হ্যাঁ, ট্যাক্সিই নেবে, ভবানীপুর তো ট্যাক্সিওলা জানবেই, তারপর রাস্তা, নম্বর। রাস্তা, নম্বর, রাস্তা, নম্বর, বড়ো রাস্তা, ছোটো রাস্তা, গলি, অলি, রোড, স্ট্রিট, নর্থ, সাউথ, আপার, লোয়ার, স্কোয়ার, লেন, বাইলেন, বাই-ওআন, বাই-টু, বাই-ওআন-বাইটু-বাই-ওআন-বাই-বি, হাজার রাস্তা, লক্ষ বাড়ি, নম্বর, শহর;

বড়ো শহর, চোর, জোচ্চোর, পিকপকেট, গুণ্ডা, বয়ফের পেসর এক পয়সা, মিঠেপান, দোকান, খরচ, বড়োলোকের শহর, মারোয়াড়ির, সাহেবের, কেরানির, বই-ছাপানো শহর, কবির, বিদ্বানের, সাহিত্যশহর, স্বর্গশহর। এইএলাম এইএলাম এইএলাম…

চারদরজার হলদে ট্র্যাম থেকে শেয়ালদতে নামলেন আরো অনেকের সঙ্গে মাঝবয়সী পাৎলাচুলের কাগজহাতে ভদ্রলোক, স্টেশন-চুড়োর ঘড়িতে একবার চোখ ফেলে আস্তে হেঁটে মেইন স্টেশনে উঠলেন, আলোজ্বলা খোপে একটু দাঁড়িয়ে প্ল্যাটফর্ম-টিকিট কিনলেন, তারপর চললেন ছ-নম্বর প্ল্যাটফর্মের দিকে।

স্বর্গনগর, স্বপ্নশহর। চোর, জোচ্চোর, খুনে, গুণ্ডা কী করবে তার? কেউ তাকে কিছু করবে না; সকলে তাকে ডাকছে এসো এসো, কলকাতা ডাকছে এসো। এই এলাম, এই এলাম—খট! হঠাৎ লাইনের তলা থেকে আর-একটা লাইন বেরোলো, তা থেকে আরো একটা, আরো, অনেক, একশো, মাইল-ছড়ানো লাইন, কাটাকুটি, মেশামেশি, লুকোচুরি, আঁকিবুঁকি, ঘটাংঘট লাইন-বদল; বড়ো, ছোটো, উঁচু, খাটো, তোলা, বাঁকা, সোজা, সিগন্যালের জঙ্গল; রেলগাড়ি, মালগাড়ি, যাওয়াগাড়ি, ফেরাগাড়ি, ডাইনে, বাঁয়ে, কোণাকুণি, এঁকেবেঁকে, তাড়াতাড়ি, আস্তে,

জা-স্তে। সে তৈরি, স্যুটকেস টেনে তুলেছে বেঞ্চিতে, তার উপর বিছানা, হাতে থ্রী মেন ইন এ বোট, দরজায় দাঁড়িয়েছে, ঝুঁকে, আস্তে, অন্ধকার, হঠাৎ যেন দমবন্ধ। গমগম গম্ভীর গুরুগুরু আওয়াজ, হুরুহুরু, আস্তে, খুব, চুপ, থামলো, এলো, পৌঁছলো, চলো, কোথায় ?